ভয়

ভয়ের লেখালেখি...

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, লিটল ম্যাগাজিন মেলা, ২০১০

'সাহিত্যে ভয়ের অনুষঙ্গ' — একটি প্রাথমিক দৃষ্টিপাত
রঞ্জন ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৫

সৎকারগাথা এবং রবিশস্য
দেবব্রত কর বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৭

ভয়ের নির্ঝর আস্ফালন   সাধকের ভাষা, সাধনার ভাষা
সোমব্রত সরকার, পৃষ্ঠা ১০

সিনেমার ভয়, ভয়ের সিনেমা
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫

সত্যজিতের ভয়-নির্মাণ   একটি অবলোকন
বিশ্বদীপ দে, পৃষ্ঠা ১৭

প্রসঙ্গ গথিক নভেল
সুদীপ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২০

ভয়ের পৌরাণিক উপকথন
শামিম আহমেদ, পৃষ্ঠা ২২

আলাপচারিতা
অদ্রীশ বর্ধন, পৃষ্ঠা ২৪

অনুক্ত ঈশ্বরীর জন্য
দিবাকর ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৯

কিল্ডারি জলার চাঁদ
দীপ ঘোষ, পৃষ্ঠা ৩৩

সম্পাদনা   বিশ্বদীপ দে, দেবব্রত কর বিশ্বাস
সহায়তা   রঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবীকা দে, অরিত্র সান্যাল, শরদিন্দু দে, বিশ্বব্রত আচার্য্য, মানস সরদার।
নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ   রাজীব চক্রবর্তী
দাম   ৫ টাকা

স ম্পা দ কী য়

বিশ্বদীপ সেদিন 'Grudge' সিনেমাটা দেখতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। আমি এখনো ভূতের ভয় পাই! সবচেয়ে অদ্ভুত, সিনেমাটা চলাকালীন ততটা ভয় করেনি। অথচ শোওয়ার পর খালি মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার থেকে একজোড়া ক্রুর চোখ আমাকে দেখছে। আশ্চর্য! বহুদিন বাদে এমন হল...

দেবব্রত আমি ভাই বরাবরই খুব ভীতু। তবে হ্যাঁ, ভূত ছাড়া কাউকে ভয় করি না। (হাসি)

বিশ্বব্রত আমি কবে যেন গল্পগুচ্ছটা নাড়াচাড়া করছিলাম, করতে করতে 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়ে ফেললাম। তখন রাত একটা, চারপাশ নিস্তব্ধ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম মেহের আলির চিৎকার!

দেবব্রত তফাত যাও সব ঝুট হ্যায়।

বিশ্বদীপ ক্ষুধিত পাষাণ নতুন করে কিছু বলার নেই তবে পড়ে যতটা না ভয় লাগে, তার চেয়ে ঢের বেশী মনখারাপ হয়। একটা পুরনো সময়ের রোমান্টিক অনুভূতিই গল্পটা থেকে আমার প্রধান পাওনা।

দেবব্রত হ্যাঁ, সে তো বটেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া প্রাচীন কোনো পাথর কাঁদছে ... পাথরের ভিতর লুকিয়ে থাকা খিদে, কান্না...

দেবীকা মেহের আলি তো পুরনো সময়ের প্রতীক, সে যেন বলতে চাইছে, এখানে এসো না, এখানে বিস্ফোরক আছে ইট মাইট এক্সপ্লোর

বিশ্বদীপ ঃ রাজতন্ত্রের মধ্যে যে ঢক্কানিনাদ, তা আসলে ফাঁপা, বুদবুদের আভ্যন্তরীণ দুনিয়ার মতন ফাঁকা, শূন্য — সব ঝুট হ্যায়।

বিশ্বব্রত ওরে বাবা, আড্ডাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। তার চেয়ে ভূত নিয়েই হোক না

দেবব্রত আরে সব ভূতের গল্পই তো ক্ষুধিত পাষাণ সবই তো পশ্চাৎদর্শন

বিশ্বদীপ ঠিক, তবে এটাই সব সেটা আমি এগ্রি করি না রে ব্র্যাডবেরীর 'এ টাচ অফ পেটুল্যান্স' পড়েছিস? সেখানে একটা লোকের ভবিষ্যৎ সত্তা এসে লোকটাকে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে তুমি ভবিষ্যতে তোমার বউকে খুন করবে একে তুই তাহলে কী বলবি? এখানে কি পশ্চাৎ আছে? মানে অতীত?

দেবব্রত আরে পশ্চাৎ মানে বলতে চাইছি সব ভূতের গল্পই তো ক্ষুধিত পাষাণ সুন্দরের আড়ালে থাকা যন্ত্রণা ব্যক্তি মানুষের পশ্চাৎদর্শন নিজের অন্ধকার দিকটুকু হঠাৎ সামনে চলে এল আয়নায় ফুটে উঠল সেই ভয়ঙ্কর ইলিউশন যা যে কোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে...

দেবীকা আসলে যে কোনো অজানাকেই ভয়, তাই না?

বিশ্বদীপ হ্যাঁ, ফিয়ার অব আননোন, লাভক্র্যাফট এর কথাটাই সত্যি।

দেবব্রত অথচ ভুতকে লজিক্যালি মেনে নিতে পারি না, মানে... পুরো ব্যাপারটাই আসলে রূপক ছাড়া কিস্যু নয়। এই যে বাংলার ভূতগুলো ...স্কন্দকাটা, যখ এসবই একেকটা প্রতীক। একটু ভেবে দেখিস।

বিশ্বব্রত সে তো ঠিকই, তবে ভূত সত্যি না হলেও ভূতের ভয়টা কিন্তু

দেবীকা ওটা একশো শতাংশ সত্যি। (হাসি)

বিশ্বদীপ জানিস, সেই যে মনে আছে, আমি আর দীপ পার্ক সার্কাসের কবরখানাটায় গেছিলাম? তখন শেষ বিকেল আলো কমে আসছে ... অথচ একটুও ভয় করেনি মনে হচ্ছিল কতগুলো পুরনো মানুষ সময় একটা মেয়ের কবর দেখেছিলাম তেইশ বছরে মারা গেছে সময়ের হিসেবে সে মারা গেছে দু'শো বছরেরও আগে অথচ কবরটা তো চিরকালই একটা তেইশ বছরের মেয়েরই কবর হয়ে আছে ঐ সময়টাকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে শুধু এই সবই মনে হচ্ছিল

বিশ্বব্রত এই রে, তুই বোধ হয় মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছিলি! (হাসি)

বিশ্বদীপ অথচ সেদিন একটা গাঁজাখুরি সিনেমার রঙমাখা ভূত দেখে ভয় পেয়ে গেছিলাম! এটা সত্যিই অদ্ভুত। কখন যে ভয় পাব, আর কখন যে ভয় পাব না

দেবব্রত বিশ্বদীপ, মনে আছে? লক্ষ্মীসায়র সেই অসামান্য সুন্দর ঝিল আর তার নিস্তব্ধ পরিপার্শ্ব অথচ পূর্ণিমার ধবধবে উপস্থিতি তাকে হঠাৎ কেমন ভূতুড়ে করে তুলেছিল। মনে আছে তুই আর আমি

বিশ্বদীপ দৃশ্যটা চিরকালীন সৌন্দর্যের একটা দৃশ্য। অথচ আমরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম।

দেবব্রত আসলে খুব সুন্দর কিছুর মধ্যেও ভয়ঙ্কর থাকতে পারে।

মানস সেটাও হন্ট করতে পারে বলছিস?

দেবব্রত অবশ্যই।

দেবীকা আড্ডাটা কিন্তু জমে গেছে। অবশ্য আজ তো এরকম আড্ডারই ওয়েদার! যা বৃষ্টি হচ্ছে

বিশ্বদীপ হ্যাঁ, এটা নিয়ে একটা কথা আমার মনে হয়। মানে একটা দৃশ্য । অন্ধকার গুহা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মুহুর্মুহু বাজ পড়ার শব্দ। আদিম মানুষ ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠছে। সেই অনুভূতিই যেন রক্তের চোরাস্রোতে মিশে আমাদের চেতনায় চিরকালীন ভয় হয়ে আছে। তাই হয়ত এই রকম আবহাওয়াতেই এসব গল্প ভাল জমে।

দেবীকা কী আশ্চর্য! এখানেও তো সেই ফিয়ার অব আননোন।

দেবব্রত একটা আইডিয়া মাথায় আসছে। এটা যদি 'ক' এর প্রথম সংখ্যার বিষয় হয়? মানে ভয়।

বিশ্বব্রত বাহ্। দারুণ আইডিয়া, এ নিয়ে কি কেউ, মানে কোনো লিটল ম্যাগাজিন কাজ করেছে?

দেবব্রত আমি তো দেখিনি।

মানস আমিও না। অথচ হওয়া উচিৎ ছিল।

বিশ্বদীপ ব্যাস্। তাহলে এটাই ঠিক হল। 'ক' এর আবির্ভাব সংখ্যার বিষয় হবে ভয়।

সবাই বেশ। তবে তাই হোক।

‘সাহিত্যে ভয়ের অনুষঙ্গ’— একটি প্রাথমিক দৃষ্টিপাত

রঞ্জন ভট্টাচার্য

ভয় পেওনা ভয় পেওনা....

অতি শৈশবে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল এর এই ছড়ার সঙ্গে আঁকা মুগুর হাতে উদ্ভট মুখের ছবিটি দেখে অল্পবিস্তর ভয় লেগেছিল বইকি। তবে সে ভয় কেটে যেতে বেশি দিন লাগে নি। আরেকটু বড় বয়সে ছড়াটাকে বেশ মজার বলেই মনে হয়েছিলো। যদিও এটি আমার নিজস্ব অনুভূতির ব্যাপার, তবুও বলা যায়, এই রকম ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ শিশুকালে যা রীতিমতো ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়, বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে সেগুলির ভয়ঙ্কর ভাব ক্রমশ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। —অতি সাধারণ হয়ে যায়। আগে সাধারণভাবে দেখা যায় ঘোর অবাস্তব এবং অদ্ভুত অনেক কিছুই আমাদের শৈশবে ভয়ের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে শিশুমন স্বাভাবিকভাবেই কল্পনাপ্রবণ। এবং সেইহেতু তথাকথিত যুক্তিবাদিতার দ্বারা আক্রান্ত নয়। সেইজন্য ঘোর অবাস্তব ও অসম্ভবের প্রতি তার আকর্ষণ সহজাত। এই সব অবাস্তব ও অসম্ভবের জগৎকে শিশুমন তার কল্পনার গাঢ় রঙে ভরিয়ে দেয় সহজে ও স্বচ্ছন্দে। এইভাবেই তৈরী হয় আর মনের গভীর গহন ভয়ের ছবিগুলি। অনভিজ্ঞতার আশ্রয়ে ও কল্পনার প্রশ্রয়ে তারা এইসব ছবিগুলি সজ্জিত থাকে শিশুমনের অনালোকিত গোপন কক্ষে। এই গোপন ঘর গুলিতেই শুরু হয় শিশুর অবচেতন মনের বিকাশ। ভয়ের জৈবনিক ব্যাখ্যা এবং শিশুমনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতে তার বিশ্লেষণ এক আশ্চর্য বিষয়। কিন্তু তা আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধিগত নয়। সাহিত্যের আলোয় দেখতে গেলে শিশু সাহিত্য ভয়ের উপাদানের ছড়াছড়ি। এবং এই ভয়ের বাহন হিসেবে সেখানে ভূতপেত্নী দত্যিদানোর বিরাট মেলা এবং সমস্ত শিশু সাহিত্যই এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির নমুনা পেশ করে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধকে ভারাক্রান্ত করা অপ্রয়োজনীয়। বরং আমরা ভয়ের আঙিনাতেই শৈশব থেকে কৈশোরে আসি।

বয়ঃসন্ধিকালে যখন প্রতিনিয়ত ভালোমন্দ উচিত অনুচিত ইত্যাদির সীমারেখাগুলি বদলাতে থাকে তখন অজানিত ও অস্পষ্ট বিষয়গুলির উপর আসে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। রোমাঞ্চ রহস্য প্রভৃতি শব্দগুলি এক বিশেষ মাত্রায় স্থান পায়। এইসব রহস্য রোমাঞ্চের রাস্তা ধরেই আসে ভয়ের (এবং ভূতের) আনাগোনা শুরু হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের ভয়ের উপাদানগুলি শৈশবের মতো অবাস্তব ও অসম্ভবের উদ্ভট রঙে রঙীন নয়। কারণ সেই শিশু তখন তার শৈশব হয়ে কৈশোরের গণ্ডিতে পৌছে গেছে। তখন অনুসন্ধিৎসা তার সহজাত। প্রশ্নশীলতা তার মুদ্রাদোষ। তাই তার আকাশে যখন ‘পরীরা আর আসে না’ তখন একানড়েরাও আর দেখা দেয় না। অতএব ভয়ের (এবং ভূতের) উপাদানগুলি বদলে যায়। অবাস্তবতার জায়গায় আসে বাস্তব ও বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিবেশ। অসম্ভব ঘটনা সরে নিয়ে জায়গা দেয় সম্ভাব্য বিষয়গুলিকে। আসে অসংখ্য দেখা আর না দেখা কিছু। অবশ্যই যথাযথ আলো আঁধারিতে। অর্থাৎ অবধারিত রহস্যে। আবার সাহিত্যের চত্বরে আমি। এরই প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় কিশোর সাহিত্যে রোমহর্ষক (তথা রহস্য-রোমাঞ্চ-ভৌতিক) সাহিত্যকর্মের বিপুলসম্ভার। এবং বিশেষত বাংলা সাহিত্যে এর আয়তন যে কি বিরাট তার প্রমাণ পাওয়া যায় যেকোনো বইমেলাতেই। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে বাড়িতে বই কেনা, পড়া কিংবা রাখা এক দুর্লভ ঘটনা, তাদের ঘরেও দেখা যায় আলমারিতে একটা শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ ভৌতিক গল্প সংকলন শোভা পাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কোনো বইমেলার সৌজন্যে কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। সাহিত্যের মূল্য বিচারে এদের অধিকাংশই উচ্চস্থানীয় নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে এগুলির সমাজ তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য কম নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্গত। আমরা এইবার ভয়ের আবছায়াতে প্রাপ্তবয়স্ক হই। কিংবা প্রাপ্তমনস্ক।

আমাদের আলোচনার এই মাত্রা থেকেই কয়েকটি বিষয়ে একটু বিশদ হওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই বলা উচিত যে ভয়ের গল্প মানেই ভূতের গল্প নয়। এবং ভূতের গল্প হলেই তা ভয়ের হবে তার কোনো মানে নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে ভয় বলতে আমরা বুঝি এক বিশেষ ধরণের জৈবমানসিক প্রক্রিয়া যা কতগুলি নির্দিষ্ট পথের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ায় আধারিত। এই প্রতিক্রিয়া মূলত তাৎক্ষণিক। যদিও কখনো কখনো সুদূর প্রসারী। এই প্রতিক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রীয় পথে প্রবাহিত হয়ে আছড়ে পড়ে শরীরে আরো কতগুলি নির্দিষ্ট স্থানে যাদের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের ওতপ্রোত সম্পর্ক। পরিভাষায় বলতে গেলে যারা সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রসঙ্গে আমরা শারীরবিজ্ঞানের দুরূহ জটিলতায় আর এগোব না। বরং আবার ফিরে আসি সাহিত্যের আঙিনাতেই। খুব সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে এই ধরণের কথাশিল্পে দেখা যায় যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও বিবরণ, সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির লক্ষণ ও প্রকাশ এবং শেষ অবধি ঘটনার পরিণতি কিংবা সম্ভাব্য পরিণতি পাঠকের মনে এমন ছবি আঁকে যা উপরিউক্ত শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এককথায় যাকে বলে ভয় পাওয়া। এই ভয় পাওয়া আঘাতে আর নানাভাবে ভূত তার একটি মাধ্যম মাত্র। এইবার আমরা আলোচনা করবো প্রাপ্তবয়স্কতা ও প্রাপ্তমনস্কতার আলোয় দেখা ভয়ের উপাদানগুলিকে। ‘ভয় আমার পিছু নিয়েছে’ একথা ভেবে হয়তো আতঙ্কিত না হলেও ভয়ের মুখ দেখেনি এরকম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিরল।

ব্যক্তি মানুষের এই ভয় আসতে পারে নানাভাবে। যা কিনা তার অস্তিত্বকে সেই সময়ে বিপন্ন করছে। একান্তে

ব্যক্তিগত আর্থিক, সামাজিক কিংবা শারীরিক (বা মানসিক) বিপর্যয় কিংবা কোনো মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষতা এই ভয়কে উৎসারিত করে। এর সঙ্গে ভূতের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের ভূত বর্জিত 'ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং' আমরা কিছু কথাশিল্পে পেয়েছি। কিন্তু ভূতের কাঁধে চেপে ভয় এসেছে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে অসংখ্যবার।

একটা মূলপ্রশ্ন এখানেই উঠে আসে যে, যার অস্তিত্বই নিঃসংশয় নয় (অর্থাৎ ভূতের) তাকে মাধ্যম করো ভয় দেখা (এবং দেখানোর) আছেটা কী। এইখানেই ভূতের কেরামতি। অজ্ঞাত বা অর্ধিজগত জিনিস মানুষের চেতনে ও অবচেতনে যে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তা সুনির্দিষ্টভাবে রূপায়িত কিংবা স্পষ্ট জিনিসের পক্ষে করা অসম্ভব। এই আবছায়া, এই অস্পষ্টতাই এর প্রধান আকর্ষক শক্তি। তাই সাহিত্যে (এবং দৃশ্যনির্ভর সৃজনশীল নির্মাণে — যেমন নাটক ও চলচ্চিত্রে) এর এতো দাপট। সাহিত্যের এই ভৌতিক ও আধিভৌতিক ভয় কিছু প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কাছে এক তীব্র স্বাদু রস। এই জাতীয় ভয়ের গল্পের পাঠকদের পঠিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব মনোগহনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ এক অত্যাশ্চর্য গবেষণার ক্ষেত্র। এ বিষয়ে ফলিত মনোবিদ্যার গবেষকদের কিছু কাজ তথাকথিত ভয়ের গল্পের দর্শন সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। আমরা সেই দুরূহ প্রসঙ্গে না গিয়ে ভয়ের গল্পের সীমাবদ্ধতা ও সীমাহীনতার প্রসঙ্গে আসি।

ভয়ের গল্পের একটি নেতিবাচক দিক হল যে এগুলি প্রথমপাঠে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার তীব্রতা পরবর্তী পাঠে অনেকটাই হ্রাস পায়। (সাধারণত দুঃখের বা হাসির গল্পের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটে না।) অর্থাৎ যে কাহিনি পড়ে পাঠকের একসময় হৃৎস্পন্দন বেড়ে যেতো সেটা হয়তো পরবর্তী পাঠে দেখা যায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যায় স্নায়ুতন্ত্রের জৈবরাসায়নিক তত্ত্বের আঙিনায়। সে ব্যাখ্যা আমাদের এই নিবন্ধে অপ্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি থেকেই সৃষ্ট একটি অনিবার্য প্রশ্নে আসি। প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়ে রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে মাথায় আতঙ্কের পোকা ঢুকিয়ে দিয়েই ভয়ের গল্পের চূড়ান্ত সার্থকতা? এর স্পষ্ট উত্তর হলো — না তা কখনোই নয়। ভয়ের গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গেলে ভয়ের অনুভূতিটিকে ছাপিয়ে যায় যখন অন্য এক বা একাধিক অনুভূতি যা কিনা আতঙ্কের নয়— হয়তো এক গভীর জীবনবোধ বা মনোজগতের এক সহজতম স্পর্শ তখনই সেই গল্পটি এক প্রকৃত সাহিত্যকৃতি হয়ে ওঠে। সেই গল্পের পুনঃপাঠ প্রতিবারই নতুন আকারে, নতুন অনুভূতিতে এসে স্থির হয়। ভয় এখানে গল্পের অপরিহার্য আঙ্গিক মাত্র। বিশ্বসাহিত্যে এই ধরণের গল্পের সংখ্যা কম নয়। মোপাসাঁ থেকে মার্কোয়েজ-এর বিস্তৃত উদাহরণ। আবার শুধু এডগার অ্যালেন পো এককভাবেই সৃষ্টি করেছেন বহুমাত্রিক বিশিষ্ট ভয়ের গল্প। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষত ছোটোগল্পের আঙ্গিকে এর প্রতিতুলনা খুঁজতে গেলে এখনো রবীন্দ্রনাথই আমাদের আশ্রয়। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায় বাংলা ছোটো গল্প যে এক আশ্চর্য অভ্রখনি সেখানে প্রাপ্তমনস্করা কী করে সন্তুষ্ট থাকবো একরাশ ভয় পাওয়ানো ভয়ঙ্কর কিংবা নিছক ভূতের গল্পে? কিংবা এর বিপ্রতীপ কোণ থেকে বলা যায় একরাশ 'তথাকথিত ভয়ের গল্প' আমাদের আর কতোদিন নাবালক করে রেখে দেবে প্রাপ্তবয়স্ক (ও মনস্ক) পাঠকের জগতে?

সৎকার গাথা এবং রবিশস্য

দেবব্রত কর বিশ্বাস

নতুন বৌঠান

মানুষ মরে গেলে তার সৎকার হয়। আগুন কিংবা মাটি গ্রাস করে নেয় আজন্ম লালিত একটা শরীর। সম্পর্ক মরে গেলে কী হয়? ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসা আলতো ব্যালকনির গোপনে লুকিয়ে থাকে সন্ধে। রোগাপাতলা, মুখভার করে রাখা কিছু নিতান্ত ছাপোষা সন্ধে। যেসব বিস্মৃতিচিহ্নের রক্তপ্রবণতার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে তার প্রকৃত সহমর্মী ছিলেন আজীবন মৃত্যুকে স্পর্শ করে থাকা এক কোমলকঠিন কবি। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন শোকের গোপনে থাকা নিরুক্ত হাসির আবছা শব্দ। সবই কি মায়া? জানলার বাইরে থাকা ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে। পঁচিশ বছর বয়সের সেই শোক অকৃতজ্ঞ বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ। কান পাতলেই সেই কান্না শোনা যায়। সর্বাঙ্গ ছমছম করে। টেবিলের সেলাই-বাক্স। ছাতে রাখা ফুলগাছের টব। খাটের ওপরে নাম লেখা হাতপাখা। সবকিছুই যেন নড়েচড়ে ওঠে। আর যে বইটি পড়া হয়নি বলে মাঝের একটি পাতায় চুলের কাঁটা রাখা আছে, তাকে দেখে কী মনে হয়েছে তোমার? মনে হয়েছে একটি পূর্ণ শ্বাসবায়ুর অর্ধেকটা বাহিরে বেরিয়েছে। বাকিটা ভিতরে। আলতো হাঁ হয়ে রয়েছে যন্ত্রণার মুখ। জিভে যেন আটকে রয়েছে চুলের সেই কাঁটা। যেন শোকের আড়ালে থাকা নির্বিকার মৃত্যুকে দেখতে পাওয়া গেল। তুমি তো জেনে গেছো ওই বই আর শেষ করা হবে না একজনের। অক্ষরে অক্ষরে চমকে উঠবে মিথ্যে স্তবকের শরীর থেকে খসে পড়া দুঃসময়। ওই যে দ্যাখো আকাশে ঝলমলে মেঘ এলো। অফুরান রোদের আদলে প্রশ্ন এলো। সম্পর্ক মরে গেলে কী হয়? উত্তর এলো — ফুলগাছের টব হয়। না-পড়া বইয়ের পাতায় চুলের কাঁটা হয়। পঁচিশ বছর বয়সের শোক শ্রাবণের মেঘের মতো কালো হয়। আজীবন আশ্বিনের প্রতিমা হয়। বেঁচে থাকার ভয় হয়। সেই ভয়কেই জীবনভর লিখে গেলেন কবি। আমার কবি। সঙ্গীহীন হাঁটতে হাঁটতে আমরাও তাঁর সঙ্গী হয়ে গেলাম। একটা গোটা জাতি দেখলো ভয়ের ভিতরেও মায়া থাকে। তারও প্রেমিক হওয়া যায়। ভয়কে ভালোবাসতে বাসতে শোককেও শান্তি মনে হবে। যাকে ভালোবাসতে না পারলে তুমি বাঁচবে না বলে ভাবছো, সে যদি চলে যায় তুমি কখনোই ঠকবে না। কেননা পুরোটা যাওয়া তার হবে না। কিছুতেই হবে না। কিছুটা ছায়া সে ফেলে যাবে। কেউ জানবে না শুধু তুমি অনুভব করতে পারবে মানুষের মতো দেখতে একটা ছায়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। তুমি কি তাকে ভালোবাসবে? নাকি ভয় পাবে?

মেহের আলি

সমস্ত বিসর্জনই জলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন প্রস্তর ফলকের ভিতর থেকে কিছু জলীয় সুর ভেসে আসতে পারে। ধরা যাক একটা প্রাচীন প্রাসাদ সুরম্য এপিটাফের মতোন দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই শুস্তা নদীর উপলমুখরিত জলস্রোত। এখানেও তো সেই জল। জলের পাশে থাকা একটা শ্বেতপাথরের মহল। তার আকর্ষণও দুর্নিবার। 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়তে পড়তে মনে হয় একটা আস্ত বাড়ি কাঁদছে। আর আমরা পাঠকেরা সেই মুখচোরা কান্নাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছি। বৃদ্ধ মেহের আলির মতোন। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এক অলৌকিক সত্তার। এই গল্পটি আসলে রাজতন্ত্রের অন্তঃসার শূন্যতাকে দিক নির্দেশ করে। তবে এই কাহিনি আমাদের যতটা ভয়ের কাছাকাছি নিয়ে যায় তার চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চিত করে। যে কোনো পুড়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কের মতোন। সমস্তটুকু শেষ হয়ে গিয়েও যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। রেশ থেকে যায় আজীবন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে আমরা ভয়ের এই অনবদ্য দিকটা দেখতে পাই। যে ভয় আমাদের মস্তিষ্কে ভয়াল রসের সূচনা করে কম। বরং সর্বাঙ্গ শিহরিত হয় মানবিক সম্পর্কের এই চিরকালীন আর্তিটুকু অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে যেখানে যেখানে পরলোকচিন্তা করেছেন সেখানেই সম্পর্ককেন্দ্রিক কিছু মানবচরিত্রের অজানা রসায়ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবমুখরতা এবং পদার্থপ্রবণতাকে ঘুলিয়ে দিয়েছে। পর্দার আড়াল থেকে বাইরে এসেছে অবচেতন। সেও যেন এক অন্য পৃথিবী। রঙিন কাচের জানলা, খিলান, বাগিচা সমেত এক দুঃসহ রাজ অন্তঃপুর। সেখানে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির মাঝখানে ভেসে রয়েছে অন্তহীন অভিসম্পাত। সেই অভিসম্পাত উচ্চারিত হয় হাসি-কান্না মুখরিত তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে। আর আমরা যারা নীলকণ্ঠের মতো সেই বিষ গলাধঃকরণ করেছি, আমরা জানি মৃত্যুর সেই ক্লান্তিহীন আকুলতা। বৃদ্ধ মেহের আলির মতোন — "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট হ্যায়।" কিন্তু কোন্‌টা মিথ্যে? ক্ষুধিত পাষাণ? নাকি রাজতন্ত্রের সাড়ম্বর উল্লাস? আর মিথ্যেই যদি হবে তাহলে তফাত যেতে হবে কেন? এই সরে থাকার আহ্বান কি আসলে মনুষ্যজন্মের সহজাত পলায়ণ প্রবণতা? আর এইসব জিজ্ঞাসার শেষবিন্দুতে অবস্থান করে এক মহান ভয়। নিজের না জানা চরিত্ররূপ সামনে চলে আসে। আয়নায় জেগে ওঠে এক ঘুমন্ত মুখ। ফেনিল ঘূর্ণাবর্ত। মনে হবে জাফরাণ রঙের কিছু ইলিউশন তোমাকে হাসাচ্ছে। কাঁদাচ্ছে। তুমি কিছু বুঝতে পারছো না। কিছুই চিনতে পারছো না। সব বদলে যাচ্ছে। এতদিনকার মুখগুলো সব অচেনা হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর পাথর হয়ে গেলো। পাথর ঈশ্বর। দেবীদের কণ্ঠে উথলে উঠলো পিশাচিনী কাব্য। অসম্ভব ভয় করলো তোমার। এখন তুমি বুঝতে পারছো সম্পর্ক মরে গেলে কী হয়? অথচ বিশ্বাস করতে পারছো না। আর তাই বেদম চেঁচিয়ে উঠেছো — "তফাত যাও, তফাত

যাও, সব ঝুট হ্যায়''। এরপর তুমি খানিকটা স্থির হবে। নিজের এতদিনের চেহারার বদল হলেও তুমি অবাক হবে না। মেহের আলিকেও চেনা চেনা লাগবে। কেননা এতদিনে তোমার ফেলে আসা অতীত শ্বেতপাথরের স্থাপত্য হয়ে গেছে। যেন এক বৃদ্ধ এপিটাফ। ক্ষুধিত পাষাণ।

মণিমালিকা

'ভূত' শব্দটির একটি অভিধানিক অর্থ অতীত। তাহলে একথা বলাই যায় ভূতদর্শন আসলে পশ্চাৎদর্শন। অথবা সঠিক অর্থে তাও হয়তো নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যত চিন্তাও মানুষকে পৌনঃপুনিক পরলোক চিন্তায় বাদ্ধ করে। আসলে বোধহয় জীবিত থাকার প্রাণপণ এক উদগ্র বাসনার শেষতম বিন্দুতে অবস্থান করে পরলোক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো তিনি পরলোক বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণায় উপনীত হতে পারেননি। কেউই পারে না। পঁচিশ বছর বয়স থেকেই তিনি প্রিয় মানুষদের চলে যেতে দেখেছেন শুধু। সেইসব শোকের অপরূপ মূর্তি ভয়ের কড়িকাঠ ডিঙিয়ে ফুল ফুটিয়েছে শান্তির গুল্মলতায়। যা ছিলো ভীষণ শোক শেষে তাই হয়েছে অনুপম শান্তি। কবিতায় ভেসে থাকা নির্মাল্য অহংকার শেষে গদ্যের সানুদেশে বিছিয়ে রাখা মায়াজ্যোৎস্নার স্বর। কোথায় কখন কীভাবে তা আচ্ছন্ন করে রাখে পাঠকের জীবনযাপন সেই ইতিহাস অজানা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের মণিহারা গল্পটি যেমন। এখানেও সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন। মানুষের মনের নানান স্তরের কিছু রঙিন কোলাজ। ফণিভূষণ সাহা স্ত্রীকে ভালোবাসতেন। স্ত্রী কিছু না চাইতেই তাকে আদরে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিতেন। কোনো দাবি না রেখেই। আর মণিমালিকার নারীহৃদয় এত কিছু পেয়েও শান্ত হতো না। তাঁর হয়তো প্রত্যাশা ছিলো বজ্রকঠিন পুরুষপ্রকৃতি। সর্বস্ব প্রাপ্তির মধ্যেও যে অপ্রাপ্তির হাহাকার মিশে থাকতে পারে তা বোঝা যায়। মণিমালিকা সনাতন নারীচরিত্রের মতোন। ছলনায়, আব্দারে পুরুষের বশীকরণ কামনা করে। সহজলভ্যতায় সে অস্বস্তি বোধ করে। 'মণিহারা' গল্পটি বাঙালি নারীচরিত্রের সনাতন ভ্রূভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এরপর আমরা যদি গল্পটির শেষাংশ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো বাঙালি জাতির আরেকটি চরিত্র বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে। বাঙালিরা সাধারণত কোনো কাহিনির রোমাঞ্চকর পরিণতি কামনা করে এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য বহু ক্ষেত্রে গুজবের আশ্রয় নেয়। ফণিভূষণ সাহার স্ত্রীর নাম আসলে নৃত্যকালী। কিন্তু কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে সেই নাম রূপান্তরিত হয়েছে মণিমালিকায়। নৌকাবিহারে মণিমালিকার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যেই এক ধরণের ভৌতিক উপলক্ষ্যের সূত্র নিহিত ছিলো। যা গল্পবিক্রেতা এবং পাঠকের রঙিন মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কঙ্কাল যখন সোনার গয়নায় সুসজ্জিত হয়ে ফণিভূষণের সম্মুখে দাঁড়ায় তখনই বোঝা যায় বস্তুবিশ্বের বিভিন্ন ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের টান, ভালোবাসা কতটা ফাঁকা, কতটা অন্তঃসারশূন্য। কতটা কঙ্কালসার। মণিমালিকার এই গল্প আমাদের ভিতরকার ভূতকে সূচিত করে যা কখনো সখনো গয়না পরিহিতা কঙ্কালের বেশে এসে আমাদের ভয় দেখায়। আর আমরা ভয়ের সরণী পেরোতে পেরোতে চলে আসি মনখারাপের সুবিস্তির্ন বাগিচায়। সেখানে বিষাদের ফুল ফোটে। বৃষ্টি হয় মনকেমনের রঙে।

ফণিভূষণ সাহার স্ত্রীর নাম মণিমালিকা না নৃত্যকালী সে তর্ক চলতে থাকুক। তবে মণিমালিকা এখানে একটি সুকোমল সময়ের দ্যোতক। দাম্পত্যের সুন্দর স্মৃতির মণিকর্ণিকা যেন মালিকার বিন্যাসে চিরজীবী হয়ে উঠেছে। আবার এও বলা যায় যে শুধু মণিরত্ন দিয়ে নির্মিত মালিকায় সার্থক সম্পর্ক রচিত হয় না।

এবারে অংকের নিয়মে আসি। এটা বলা যায় যে ফণিভূষণ সাহা আর মণিমালিকার সম্পর্কটি অতীত। অর্থাৎ সম্পর্কটি ভূত। কেননা আভিধানিক অর্থে অতীত = ভূত। অতঃপর কী হলো, মহামতি সময়ের নিরুক্ত ব্যাঞ্জনায় সূচিত হয়ে গোটা একটা সম্পর্ক 'ভূত' হয়ে আমাদের ভয় দেখালো। আর শেষ অবধি আমরা কী পেলাম? আমরা খুঁজে পেলাম এক অসহায় ফণিভূষণ সাহাকে, যাঁর জীবনে কখনো কোনো 'মণিমালিকা' ছিলোই না। কী আশ্চর্য!

মনোরমা

'নিশীথে' পড়া শেষ করে আরেকবার মনখারাপ করলো। যেন সমস্তটাই অসীম পরিহাস। জীবনের সঙ্কুল সরণীতে উথলে ওঠা জলস্রোত। কেউ ভেসে যায়। কেউ বেঁচে ফিরতে পারে। দক্ষিণাচরণবাবুর অবলা স্ত্রী পারেননি। আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় মনোরমা ব্যথা কমানোর যে নীল রঙের শিশি-র মলম এনেছিলেন তা দূরভিসন্ধিমূলক। আবছা অন্ধকার ঘরে মনোরমা যখন প্রথম দেখা দিলেন তখনই দক্ষিণাচরণবাবুর স্ত্রী চমকে উঠে বলেছেন — ''ওকে! ও কে গো!'' অসুস্থ স্ত্রী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন অচেনা নারীর ছদ্মবেশে তার জীবনের দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে এক পরিহাসময় মৃত্যু। কীসের মৃত্যু? এতদিন লালন পালন করে আসা একটি কোমল কঠিন সময়ের মৃত্যু। একটি সম্পর্কের মৃত্যু। মনোরমা তার উপলক্ষ্য মাত্র। আর এই মৃত্যুময় হাহাকার দক্ষিণাচরণবাবুর পরবর্তী দাম্পত্য জীবনেও অস্বস্তি বয়ে আনে। সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন এক বিকট হাসি ভেসে বেড়ায়। সম্পর্কের মৃত্যু যারা প্রত্যক্ষ করেছি তারা প্রত্যেকেই এই হাসি শুনে ভয় পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ 'নীশিথে' গল্পটিতে একটি রূপক বুঝিয়েছেন। পদ্মার তীরে এক নিস্তরঙ্গ চরাচরে যেখানে দক্ষিণাচরণ ও মনোরমা অন্তরঙ্গ হলেন সেখানে চরবিহারী জলচর পাখির ডাক এলো — ও কে! ও কে গো! মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরণের প্রেম যেন চিরকালীন বিশ্বাসের মূলে কশাঘাত করতে চাইছে। তাই আধপোড়া সম্পর্কের ধ্বংসস্তুপের থেকে পৌনঃপুনিক হাহাকার উঠছে। এই অন্ধকারের কোনো আরোগ্য নেই। নিঃশর্ত সমর্পণের মতোন। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের এক অনুপম সমীকরণ দেখা যায়। কবির

প্রকাশভঙ্গির সুনিপুণ দক্ষতায় আমরা ভয়ের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি। আমাদের চেতনায়, অবচেতনে কোথায় কতটা ভয়ের আবেশ তৈরী হয় তার খবর ঈশ্বর জানবেন। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে সেই নিরুক্ত ঈশ্বরের মতোন।

সংযোজন

দিনের পরিচ্ছন্ন আলোয় যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় রাতের অন্ধকারে সেই রাস্তায় যেতে গা ছমছম করে। অর্থাৎ এটা বলাই যায় যে ভয়ের অনুভূতি অন্ধকারে হয়। সেই অন্ধকার জাগতিক হতে পারে অথবা মানসিক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই অন্ধকারের রহস্যভেদ করে আলোর সন্ধান করেছেন। তাই তাঁর লেখা পড়ে ভয়ের বদলে মনকেমন করা এক অনুভূতি হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কি গল্পে কি কবিতায় কি নাটকে অসংখ্য ভয়ের অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু সবকিছু সবাই সমানভাবে ছুঁতে পারে না। আমিও পারিনি। আর রবীন্দ্র সাহিত্যে ভয়ের উপাদান সমূহকে লেখায় ধরতে গেলে তার পরিসর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে ভাবিয়েছে তা হলো সম্পর্কের ধ্বংসস্তুপের থেকে ছিটকে আসা কিছু নারকীয় আর্তনাদ। মানুষের মৃত্যু আছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মৃত্যু নেই। সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও তা বেঁচে থাকে। নির্ধারিত সময়ের গণ্ডী পেরিয়ে আমাদের মনের গোপন আকাশে যেন আবছা ধ্রুবতারা।

মানুষের ভবিতব্য এমনই যে তার যেকোনো কিছুই ছবি হয়ে যায়। বাঁধানো ফ্রেম কিংবা অ্যালবামে আশ্রয় নেয়। কিছু কিছু সম্পর্কের শেষ পরিণতি এমন হয় যে তাকে প্রকাশ্যে আনা যায় না। গোপনে গোপনে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। আমরা প্রকাশ্যে হাসি মুখরতায় বেঁচে থাকি। অন্যরা ভাবে মানুষটি সেই মৃত সম্পর্কের আগ্রাসন পেরিয়ে এসে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন। আসলে ভুল ভাবেন। রঙিন পোশাকের আড়ালে মানুষটি গোপন রেখেছেন পুরনো হৃৎপিণ্ডের শব্দ। আড়ালে সহ্য করেছেন পুরনো রক্তপাত। শুধু জীবনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মানুষেরা এক তীব্র আর্তনাদ শুনতে পান। অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হন। আর তখনই মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এক মহান ভয়। পুরনো ভালোবাসার ভাতগন্ধ মাখা এক অনুপম ঐশ্বরিক ভয়।

রোঁয়াওঠা সকালের আড়ালে থাকুক বিষণ্ণ অন্ধকার... স্পষ্টতার বিপরীত প্রান্তরে থিতু এক আজীবন একলা ব্যালকনি থেকে দেখা দৃশ্যাবলী নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ—

নাবিক বিন্দু থেকে

অরিত্র সান্যালের প্রথম কবিতাবই

প্রকাশিত হয়েছে প্রতিভাস থেকে বইমেলায় পাওয়া যাবে। দাম ৭০ টাকা

ভয়ের নির্ঝর আস্ফালন সাধকের ভাষা, সাধনার ভাষা

সোমব্রত সরকার

ভাষাকে হতে হবে সাধুর মতো। তবে ভাষা আমাদেরকে টানবে, আকর্ষিত করবে। তা সে যেই ভাষাই হোক না কেন। প্রেমের ভাষায় যদি দীপাবলির উন্মেষ না থাকে, বিরহে অপ্রতিহত ব্যথার সৌন্দর্যই যদি না আসে তবে সে ভাষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের সাহিত্যের সঙ্গীতের নাটকের সিনেমার — প্রতিটি সৃজনক্ষেত্রের ভাষার মধ্যেই আমরা সম্মোহন দাবী করি। যার প্রধানতম শর্তই হল — আমাদেরকে টানবে, আকর্ষণ করবে। তবে না সে ভাষার সার্থকতা।

এখন প্রশ্ন হল, ভাষাকে কেন বলছি সাধুর মতো হতে হবে? কারণ ভাষা যদি অভূতপূর্ব মাদকতায় আমাদেরকে না টানে, চিত্তস্থৈর্যে বসাতে না পারে, শুশ্রূষার আঁধারে চমকিত করতে না পারে তবে সে ভাষা বৃহত্তর, মহত্তর, সমৃদ্ধতর, সম্পূর্ণতর সুষমা অর্জন করতে পারে না কখনও।

সাধু আমাদেরকে চিরকাল টানে, আকর্ষণ করে। তাঁর লাল কাপড়ের তীক্ষ্ণতর আপাতিক রেখা আমাদেরকে বিদ্ধ করে। যদি সে সত্যিকারের সাধকের প্রব্রজ্যা নিয়ে আমাদের সামনে আসে। তবে ভন্ড ঠগ প্রতারক ভিখারিবেশী সাধুবাবা আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও আমরা একটিবারের জন্য হলেও তাকে দেখি। নিরীক্ষণ করি। কেননা আমাদের প্রবণতা যথেষ্ট কৌতূহলের। ভাবের মস্ত আধার আমরা ঐতিহ্যসূত্রে অর্জন করেছি। আমাদের রক্তে মিশে আছে ভাবের পরম প্রতিক্রিয়া। যা আমাদেরকে ভন্ড সাধুকে দেখবার জন্যও ইন্দ্রিয়গত ইশারায় পন্থা সৃষ্টি করে আমাদের মস্তিস্ক। এ আমাদের সহজাত। আস্তিকতা নাস্তিকতার প্রবণতাকে আক্রমণ করে আমাদের ইন্দ্রিয়। আমরা সাধুকে দেখার ঝিকিমিকি প্রয়াসের সেই অমলমন্ত্রে কোথাও যেন জাগরিত হই। আমাদের সত্তা উপজীব্য হয়। সাধু ও সাধনার উত্তাল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কোথাও কখনও আমাদের প্রবেশ করতে ইচ্ছে জাগে। যার জন্য তারাপীঠে, গঙ্গাসাগরে, কুম্ভে — সাধুসন্তের ভিড়ে আমরা ছুটে যাই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর বেশি আনুপূর্ব বিদ্যুৎক্ষিপ্রতা আমাদের নেই। আমরা প্রকৃত সাধকের ধারেপাশে যেতে পারি না কখনও। হাজারো সাধুর ভিড়ে সেই জীবনানন্দ কথিত 'কেউ কেউ কবি'র মতো 'কেউ কেউ সাধু' খুঁজতে আজকে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেত হয়। কেন না লাল কাপড়ের গমকে এখন রয়েছে জীবিকার মহামারী। সাধনার ধৌতকণা অর্জন করতে পারেন কেউ কেউ। এখনও এমন সাধক আছেন নিশ্চয়ই। আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে।

এ রচনা খানিকটা সেই সাধুসঙ্গের। তবে তারা সকলেই প্রকৃত সাধক কিনা তা জানা বা জানানোর বিমল উৎপাত এ রচনা নয়। এখনো আমরা যেটা দেখাতে চাইছি, বোঝাতে চাইছি বা খুঁজতে চাইছি তা হল সাধকের ভাষা, সাধনার ভাষা। যেখানে এক প্রসারিত পরিধি আছে। রহস্যজট আছে। আছে সিদ্ধি অসিদ্ধির নর্তন-কুর্দন। ভয় আমরা সেই অচিন্ত্যের বিস্ময়জনক অভিধান এখানে রচনা করব যা খানিকটা হলেও ভয় ও ভীতির। এ রচনা এক অভিজ্ঞান মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। ভয়ের নির্ঝর আস্ফালনও এ রচনাকে আমরা অনায়াসে বলতে পারি। এ রচনার তাই কোনও দায় ও দায়িত্ব নেই। ব্যক্তিগত সঙ্গ ধূসর-হয়ে-যাওয়া প্রমাণকল্প নিয়ে এ রচনা কেবল সাধনার ভাষাকেই খানিকটা লিপিবদ্ধ করতে তৎপর।

এর বেশি কোনও অভীপ্সা নেই এ রচনার। পাঠক তাই পরিণত ভূমিতে না পৌঁছলেও যাতে হতাশ না হন সেজন্য প্রথমেই এক নির্দেশিকা জারি রইল।

(দুই)

ডুবতে কি সবাই পারে,
রূপসাগরে তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।

দ্বারকার তটে বসে আছি। অদূরে জটাবাবা স্নান সেরে তাঁর দীর্ঘ জট তটের বালিতে ফেলে শুকোচ্ছেন। স্নানের আগে দেখেছি বাবার জট মাথার মুকুট করে বাঁধা। আমি বাবার ত্রিশূল এনে ভেজা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করছি। পাশে আমার বন্ধুবান্ধব। এই ফাঁকে দেখি ভৈরবী মা কখন আমার ঘাড়ে হাত রেখেছেন।

— বাবা, হৃদয়টা খুঁড়ে জল বের কর না। ওটা যে তোর ফল্গু। টলটল টলটল বয়ে যাচ্ছে। বলেই মা এ মস্ত হাসি দিলেন, তাঁর হাসির শব্দে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল যেন।

গতরাতেই বামাক্ষ্যাপার সমাধিমন্দিরে মায়ের সঙ্গে আলাপ। আলাপ আজ এখন বেশ সদভাবেই পরিণত হয়েছে। আজ অমাবস্যা। রাতে মা আর জটা বাবা তারাপীঠের মহাশ্মশানে তন্ত্রক্রিয়া হোমযজ্ঞ করবেন। আমার নেমন্তন্ন।

কালকেই মায়ের সঙ্গে পঞ্চমকারে সাধনা নিয়ে বিস্তারিত কথা চলেছে আমার। তা যেমন যেমন জেনেছি বুঝেছি রপ্ত করেছি সাধকসঙ্গে, সাধুসঙ্গে, সাধনসঙ্গে তার খানিকটা এখানে ব্যপ্ত করি।

তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্যই হল পাশ মুক্ত হওয়া। পাশ কী? পাশ হল রজ্জু বা দড়ি। বাঁধা। বন্ধন। তন্ত্রসাধনায় এই পাশকেই আগে ছিঁড়তে হয়। এই পাশ হল লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি। পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ। পাশ থাকলেই জীব ভয় পায়। পাশ মুক্ত হলেই সে শিবে পরিণতি পায়।

আমরা জানি তন্ত্র ধর্ম হল শিব প্রচারিত শক্তির উপাসনা। শিবকে আমরা তন্ত্রজ্ঞপুরুষ হিসাবে দেখতে পারি। আমরা যদি শিবের মহিমা থেকে দেবতার খোলস খুলে ফেলে শিবকে দেখি তবে দেখব শিব শ্মশানে মশানে থাকেন, ছাইভস্ম মাখেন, গাঁজা ভাঙ খান, বাঘছালকে কৌপণ করে পড়েন এসবই কিন্তু

তন্ত্র সাধনার যথার্থ উপকরণ। তন্ত্রে শ্মশান সাধনার উজ্জ্বল স্থান। আর তন্ত্রসাধনায় ভৈরবী বা সঙ্গিনী অনিবার্য। কেন? সে উত্তরে পরে আসছি। আগে পাশমুক্তির কথা বলি।

ঘোর অমাবস্যায় তন্ত্র সাধনার প্রথম স্তরটি সাধিত হয়। ভয়কে দূর করবার জন্য শবের উপর বসে ধ্যান করতে হয়। কামকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ভৈরবীর সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ার ভেতরেও জপে ধ্যানে তন্ময় হতে হয়। মনের সংকোচ, শুচি-অশুচি ভাব ত্যাগ করতে হয়। জনশ্রুতি : বামাক্ষ্যাপা কুকুরের মুখের মাংস টেনে নিয়ে নাকি খেতেন। আবার অঘোরী সাধুরা মরার মাথার খুলি দাহকার্যের সময় ফাটলে তার ঘি বা রস এনে নাকি ভাতের সঙ্গে মেখে খান। সবই সাধনকল্পের ব্যাপার। পাশ মুক্তি না হলে কখনওই এসব সম্ভবপর নয়ই।

তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম' কারে সাধনার কথা বলা হয়। তবে স্থূল অর্থে মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন বলতে যা বোঝায় এগুলো তা নয়। এগুলো সবই প্রতীককল্প। পূজায় যেমন ফুল ব্যোমের প্রতীক, চন্দন মৃত্তিকার প্রতীক, ধূপ বায়ুর প্রতীক, প্রদীপ অগ্নির, খাদ্য জলের। আসলে এই সব উপাচার পঞ্চভূতের প্রতীক।

পঞ্চ 'ম' কারের প্রথম যে মদ্য, তা হল যোগকালে বা যোগসাধনায় বা কল্পে কুলকুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে প্রবেশ করলে সেখানকার স্নায়ু থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তা — সোমধারা ক্ষরেদ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। / পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ এব মদ্য সাধকঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হতে যেই সুধা ক্ষরে সেই সুধা হল মদ্য)। স্থূল অর্থের কারণ তা কখনও নয়। মাংস হল সাধন যখন বাক্ সংযম করে মৌণ হয়ে যান সেই স্থিতাবস্থা। মাশব্দাস জ্ঞেয়া তদংশান রসনা প্রিয়ান। / সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাক্য ভক্ষণ করে বাক্‌সংযত সেই নির্বাক মহাসাধু মাংসের সাধক। মা শব্দ হল রসনা। বাক্য তার অংশ মাত্র। মৎস্য হল দুটো নাড়ি — ইড়া, পিঙ্গলা। বলা হয়েছে : গঙ্গাযমুনয়ো মধ্যে মৎস্য দ্বৌ চরতঃ সদা। / তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক। অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা বা দেহের মধ্যে মৎস্যরূপী দুটো নাড়ী ঘুরে বেড়ায় যে সাধক তা নাশ করতে পারেন তিনি মৎস্যসাধক। মুদ্রা হল আমাদের মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধ অংশে সহস্রার মহাপদ্ম আছে যা জাগলে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় জ্যোতি বেরোয়। যিনি দেহের মধ্যে যোগবলে এই পরমানন্দকে লাভ করে তিনি মুদ্রাসাধক। মৈথুন হল সিদ্ধি। নাদ ও বিন্দু যুক্ত হয়ে যে পরম পুরুষ রয়েছেন তিনি রমণ করে মৈথুনের অবসান করেন। সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে শিবের সঙ্গে মৈথুন করতে পারেন। যিনি পারেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক।

এই পঞ্চ 'ম' কার রপ্ত না হলে তান্ত্রিকসাধনে কিছুই উন্নতি সম্ভব নয়। আর তাতে সিদ্ধ না হলে সাধনের প্রথমাবস্থাতেই অকৃতকার্য হতে হয়। তাই এই পদ্ধতি রপ্তের সময় ভয় জন্মে। ভীতি আসে অনেকটা পরীক্ষার আগের রাতের মতো ভয়। আর মৈথুনক্রিয়ায় সিদ্ধির সময় সাধকের ভয় আসে চূড়ান্তে এসে অকৃতকার্য হব কিনা সেই ভয়। কারণ এদিনই বা এ সময়ই পাশফেলের রেজাল্ট। শুধু তন্ত্রমত কেন বৈষ্ণব মতেও এই পঞ্চ 'ম' কারের ভূমিকা রয়েছে। সেখানে মদ হল সুধাকল্প। মাংস হল যে ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদিকে ছেদন করে ব্রহ্মানন্দপ্রদ নির্বিষয়রূপ মাংস ভক্ষণ করেন তিনি মাংসসাধক। মৎস্যসাধক হলেন তিনি, যিনি দম্ভ, অহংকার, হিংসা, পশুত্ব, মদ, মৎসর্য এই ছয়টি মৎস্যকে বৈরাগ্য ক্রিয়ায় ভক্ষণ করতে পারেন তিনি মৎস্য সাধক। মুদ্রা সাধক যিনি, তিনি ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা, আশা, পিপাসা, জুগুপ্সা, ক্রোধ — এই অষ্টমুদ্রাকে জয় করতে পারেন। মৈথুন সাধক প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুকে যোগবলে একীভূত করতে পারেন। তবে এখানেও ভয়ের মাজার তৈরী। সবাই পাশমুক্ত হতে পারেন না। হলেও কারও কম সময়, কারও বেশি সময় লাগে। কেন না ভাল ছাত্র খারাপ ছাত্রের ব্যাপার এখানে থাকে। আবার গুরুরও তো ভালমন্দ আছে।

আমরা সাধকের ভাষা, সাধনের ভাষার পঞ্চ 'ম' কারের গুহ্য তত্ত্বটি খানিক জানলাম। সাধনকল্পে না এলে তা পুরোপুরি জানা সম্ভবও নয়। যেটুকু জেনেছি, শুনেছি, বুঝেছি তার থেকেই একটু ক্রিয়াকল্প উল্লেখ করলাম। আমাকে হালিশহরে রামপ্রসাদ ঘাটের ছিন্নমস্তার উপাসক আলো সাধু যেমন যেমন বলেছিলেন আর তার সঙ্গে শাস্ত্রমত যোগ করেই এই গুহ্যভাষাকে উল্লেখ করলাম। যা সম্পূর্ণ এরকম দাবী আমি কখনওই করছি না। পাঠককে এটুকুই এখানে যা বলার।

এবার আমরা কুলকুণ্ডলিনীর রহস্যভেদ করব খানিকটা। সাধকের ভাষায়, সাধনার ভাষায় যা একটি জরুরি বিষয়।

(তিন)

সহজ পথে উছট্ লাগে ওরে মন কানা;

(ও) তুই আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।

তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তি হল যন্ত্রসাধনা, মন্ত্রসাধনা, শব সাধনা, ভৈরবী সাধনা। কিন্তু এগুলো সব হল গিয়ে বাহ্যিক তন্ত্র। ভেতরের তন্ত্র বা আরম্ভতন্ত্র হল গিয়ে যোগ। যাকে কুন্ডলিনী যোগ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তন্ত্র কী? তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম, অনেম ইতি তন্ত্রম। অর্থাৎ যে জ্ঞান বিস্তারিত হয়ে তারণ (ত্র) করে তাই হল তন্ত্র। তন্ত্রের একেবারে প্রথম পাঠ হল পাশ মুক্তি বা পঞ্চ 'ম' কার সাধনা। অনেকে ভাবেন এটা ইন্দ্রিয়ের সাধনা। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকের কাছে এ সাধনা ইন্দ্রিয় জয়ের সাধনা। সাধারণ একটা প্রবাদ আছে, লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়। তন্ত্রের কানুনে এ তিনটি তো পাশ।

এ সাধনা যথার্থ গুরু কেন্দ্রিক। গুরুই পথ দেখান। সিদ্ধগুরু না হলে সাধক তো পথভ্রষ্ট হবেনই। আর এখানেই অকৃতকার্যের ভয়।

গুরু কথার অর্থ কী? গু হল অন্ধকার, রু হল আলো। অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানতার তিমির থেকে শিষ্যকে উদ্ধার করেন, পথ দেখান তিনিই গুরু। গুরুই শিষ্যকে পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা

শেখান। কুন্ডলিনী যোগ গুরু নির্দেশিত হয়ে থাকে। তন্ত্র সাধনা যেহেতু শরীর সাধনা যাকে কিছু আগে যন্ত্র সাধনা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করেছি। এই যন্ত্রসাধনা হল কুলকুন্ডলিনীর সঠিক মাত্রার জাগরণ। প্রসঙ্গত মন্ত্র সাধনা সম্পর্কে এখানে একটু বলে নিই। মন্ত্র হল জপ। বলা হয় : জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ। অর্থাৎ জপ ছাড়া কখনওই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জপ করার অর্থ ইষ্টদেবতার ধ্যান। তাঁর প্রতি মগ্নতা। এই মগ্নতা না এলে কিছুই সম্ভবপর নয়। শব সাধনা প্রসঙ্গে অঘোরীদের কথা আসবে আর ভৈরবী সাধনা, ভৈরবী চক্র নিয়েও পরে বিস্তারিত বলছি। এই দুই সাধনাতে কিন্তু মিশে আছে হাড় হিম ভয়। সে সব পরে আসছি। তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তির যন্ত্রসাধনা নিয়ে এখন কথা বলব আমরা। যন্ত্রযোগেই কুন্ডলিনী শক্তি জাগে আমাদের।

চাকদা গৌরনগর শ্মশানে বেশ কিছুকাল আগে ক্ষ্যাপা ব্রহ্মানন্দ সাধন ভজন করতেন। তাঁর সাধনসঙ্গিনী ছিলেন মানদা ভৈরবী। ভৈরবী আমাকে ছেলে বলতেন। কতদিন এমন হয়েছে মা আমাকে তান্ত্রিকসাধনার মহাপ্রসাদ মাছপোড়া জোর করে খাইয়ে দিয়েছেন। আমি বাউল সঙ্গে সাধুসঙ্গে খানিকটা ঘুরে এটুকু উপলব্ধি করেছি বাউলরা কখনও কাউকে গাঁজা নিয়ে এবং তান্ত্রিক সাধকরা কারণ নিয়ে কখনওই ভক্তশিষ্যদের জোর করেন না। আমি বেশ ছোট বয়স থেকেই বাউল আখড়ায় যাতায়াত করি। তান্ত্রিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় তার কিছু পরে। সে যাই হোক। কুন্ডলিনী যোগ আমাকে প্রথম বোঝান মানদা ভৈরবী। পড়ে আমি পুরুলিয়ার দেউলঘাটার ভৈরবী মা, হালিশহরের গৌরী মা-র কাছ থেকে আরও কিছু জেনেছি আর কিছু জ্ঞান আমার বই পড়ে। ভৈরবীদের সঙ্গেই আমার বেশি সদ্‌ভাব। গৌরী মা পান সেজে আমাকে খাওয়াতেন। মায়ের গোপাল-সুরভি জর্দার আমি যোগানদার ছিলাম। ভৈরব বা তান্ত্রিক সাধকদের ধার আমি বেশি ঘেঁষতে পারিনি। ক্ষ্যাপা ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলতেন, তুই ছোরা এসব জানবি কী রে? তোর তো দুধের দাঁত পরেনি এখনও।

আলো সাধুকে একবার কুন্ডলিনী যোগের কথা বললে বলেছিলেন, তোর যোগ শুরু হয়েছে রে।

— কীভাবে? আমি যে এর কিছু জানি না।

— ওরে শালা। কোনও মাগী তোর শিরদাঁড়ার নীচের দিকে হাত দিয়েছিল কি না বল?

— হ্যাঁ, সে তো আমার প্রেমিকা

— ওই মাগীই তোর মূলাধার চক্রের গাট খুলে দিয়েছে রে। তন্ত্র সাধনে মাগী হল গিয়ে মা। একটু বড় বয়সে মাও যদি ছেলের শিরদাঁড়ার নীচ দিকে কোনও কারণে হাত রাখে গাঁট খুলে যায় রে। যা তোর হয়ে গেছে। মাগীই তোর সর্ব্বোনাশ করেছে।

আলো সাধুর কথাই হয়তো সত্যি। মেয়েরা আমাকে চিরকালই নানাভাবে সব সময়ই আকর্ষণ জোগায়। প্রেমে-স্নেহে-শ্রদ্ধায়।

মানদা ভৈরবী একদিন আমার শিরদাঁড়ার নীচের দিকটা খানিক ছুঁয়েই বলেছিলেন, এখানেই মূলাধার আর মেরুদণ্ড ভেদ করে সোজা যা উঠে গেছে তা স্বাধিষ্ঠান। তারপর মণিপুর। এভাবেই মা আমাকে নবচক্র চিনিয়েছিলেন। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জেনে বুঝে পড়ে যা বুঝেছি তা এখানে ব্যপ্ত করি।

তবে প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন জাগা উচিৎ কুন্ডলিনী কী? উত্তরে বলি কুন্ডলিনী হল নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি। এটা দেখতে অনেকটা অর্ধ ওঙ্কারের মতো। তার দুটো মুখ, বিদ্যুৎলতার মতো অতি সূক্ষ্ম তার অবস্থান। শিবসংহিতা বলছে

পশ্চিমাভিমুখী যোনিগুদমেঢ্রান্তরালগা। / তত্র কন্দঃ সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুন্ডলী সদা।। অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যখানে যে যোনিমন্ডল তার মধ্যে কুন্ডলিনীশক্তি নাড়ী সকলকে ঘিরে ধরে সর্পের মতো পেঁচিয়ে আছে। সাধককে এই সকল নাড়ীই জাগাতে হয় যোগক্রিয়ায়। যা তন্ত্রসাধনা। এখানে নটি চক্র থাকে। যোগক্রিয়ায় যা জাগরিত হয়। তন্ত্র সাধনায় এটি ঠিকমতো না জাগলে গাট না খুললে কোনও উন্নতিই সম্ভব নয়।

আমাদের দেহের গুহ্যদেশ থেকে দুই আঙ্গুল ওপরে ও লিঙ্গমূল হতে দুই আঙ্গুল নিচে চার আঙ্গুল বিস্তৃত যে যোনিমণ্ডল তার ওপরে মূলাধার চক্র। এটা দেখতে অনেকটা চতুর্দ্দলবিশিষ্ট পদ্মের মতো। তাই একে মূলাধার পদ্ম বলে। এই পদ্মে ধ্যান করলে বাক্‌সিদ্ধি আসে।

লিঙ্গমূলের সংযোগস্থলে যে পদ্ম আছে তার নাম স্বাধিষ্ঠান। এটা ষড়দলের। অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্বনাশ, হিংসা এই ছটি বৃত্তিতে এটা তৈরি। এই চক্রে বা পদ্মে ধ্যান করলে ভক্তি আসে।

নাভিদেশে আছে মণিপু চক্র। মূলাধার রক্তবর্ণের। স্বাধিষ্ঠান অরুণবর্ণের আর মণিপুর মেঘবর্ণের। এটা দশদল যুক্ত। এখানে লজ্জা, ঈর্ষা, বিষাদ, সুষুপ্তি, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়, পিত্তনতা, তৃষ্ণা — এই দশটি বৃত্তি রয়েছে। এই পদ্মে ধ্যান করলে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়। এ ঐশ্বর্য কিন্তু টাকাপয়সা নয়। ঐশ্বরিক আনন্দ।

হৃদয়ে অনাহত পদ্মের অবস্থান। এর রং সিঁদুর রঞ্জিত। মোট বারোটি দলে পদ্ম এটি। এখানে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহংকার, লোলুপতা, কপটতা, বিতর্ক অনুতাপ নামে বারোটি বৃত্তি আছে। এতে ধ্যানে বসলে অনিমাদি লাভ হয়।

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধপদ্ম অবস্থিত। এর রং ধূম্রবর্ণ। ষোড়শদলের পদ্ম বিশুদ্ধপদ্ম। এই পদ্মে ধ্যানে বসলে জরা ও মৃত্যুনাশ হয়।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাপদ্ম থাকে। এর দুটি দল। শ্বেতবর্ণের, আজ্ঞাচক্র বা পদ্মের ওপরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীর মিলনস্থল। তা একে ত্রিবেণী বা ত্রিকূট বলা হয়ে থাকে। আড্ডাচক্রকে জ্ঞানপদ্মও বলা হয়ে থাকে। এই পদ্মে ধ্যান করলে নির্বাণ লাভ হয়।

তালুমূলে ললনাচক্র থাকে। রক্তবর্ণ। চৌষট্টি দলের পদ্ম

এটি। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম,উষ্মি, শুদ্ধতা — এই দশটি বৃত্তি থাকে। এই পদ্মে ধ্যান করলে উন্মাদ, জ্বর, পিত্তজনিত দাহ ইত্যাদি দূর হয় এবং শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুচক্র থাকে। শ্বেতবর্ণের এটি। এই পদ্মে ধ্যান করলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূন্যে থাকে সহস্রার পদ্ম। এর একশটি দল। রক্তবর্ণের। এই পদ্মে ধ্যানে বসলে জগদীশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়।

নটি পদ্ম বা চক্রের কথা আমরা জানলাম। এতে সকলে যে সিদ্ধিলাভ করেন না নয়। সম্ভবও নয়। কঠিন এ যোগ। এ যোগে সিদ্ধি এলেই ভৈরবী সাধনা। যা যথেষ্ট ভয়েরই। বিপর্যয়ের।

আমরা সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব।

(চার)

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে বিষয়-বাসনা সনে।

প্রথম ভৈরবী আমি দেখি মানদা মাকেই। আমরা দুই বন্ধু শ্মশানঘাটের কিছু দূরে আঘাটায় বাঁধা নৌকার ওপর বসেছিলাম। গুটগুটে অমাবস্যার রাত, অন্ধকার আমার খুব প্রিয়। আরেক প্রিয় জিনিস হল নির্জনতা। এ দুটোকে পেতে তখন আমি প্রায়-প্রায়ই শ্মশানে আসতাম। আমরা দুই বন্ধু বুঁদ হয়ে আছি অন্ধকারে, নির্জনতায়। তখনই দেখি আঘাটায় মানদা ভৈরবী। লাল কাপড়, এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, দুই বাহুতেও মালা, হাতে শাঁখা নয় পলা ভর্তি দুহাতে, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, কাঁধে লাল কাপড়ের বোঁচকা। ডান হাতে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল ও পেতলের কমণ্ডলু।

মা হাঁকলেন। বললেন এত রাতে এখানে তোরা?

আমি বললাম : অন্ধকার চিনতে এসেছি আমরা।

তিনি বললেন, কালী তো আস্ত অন্ধকাররে। ওকে চেন ভাল করে। বলে মা গটগট করে হেঁটে গেলেন নিমেষে। তারপর চারধার নির্জনতা। অন্ধকারকে অন্ধকার বলেই মনে হচ্ছে। শিয়াল ডাকছে।

কিছুপর দেখি অদূরে যজ্ঞের আগুন। আমরা দুই বন্ধুও খানিকটা আলোকিত হয়ে উঠেছি আগুনে।

মা ডাকলেন বাবারা এদিকে আয় দিকি।

বন্ধুটি বলল : যাবি। দেখবি পয়সা চাইবে।

আকর্ষণ বসত গেলাম। মা পাশে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে কপালে তিলক কেটে দিলেন আমায়। বললেন : যা কালীর বেড়া দিয়ে দিলাম তোর। এবার ছুটে মর অন্ধকারে। সেই থেকে শ্মশান মশান আমার ভাল লাগে। একা বসে আমি নির্জনতা অন্ধকার ভোগ করি।

এরপর মা আমাদের মাথায় যজ্ঞের আগুন ছুঁইয়ে বললেন, যা যা পালা। এখন এখানে থাকবি না। আজকে ভৈরবীচক্র বসবে। অন্যদিন আসবি। আলাপ জমাব তখন।

আমি মাকে পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে দিতে প্রণাম করতে যাই। মা প্রণাম নেন। টাকাটা নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেন, কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দিস বাবা। এ টাকা ওর কাছে অনেক।

বন্ধুটি তখন আমার নির্বাক দর্শক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তন্ত্রসাধনায় ভৈরবী প্রয়োজন কেন। ভৈরবের ভৈরবী এবং ভৈরবীর ভৈরব। কারণ সেই বিপরীত বিহার। যেজন্য বাউল সাধনাতেও সঙ্গিনী লাগে। সে সাধনাও গুহ্যসাধনা। সাধন সঙ্গিনীকেও সমান তালে যোগক্রিয়া শিখতে হয়।

সাধকরা ভৈরবীকে মা বলেন। কারণ তন্ত্রমতে কামিনী ও জননী একই। কামিনীর মধ্যে সম্ভোগপ্রবণতা আরোপিত আর জননীর মধ্যে স্নেহপ্রবণতা। এই দুই ভাবই তন্ত্রসাধনায় প্রয়োজন। তন্ত্রে সম্ভোগ কামনালেশশূন্য। এই সম্ভোগে আনন্দময়ী ভাব আসে। মন্ত্র সাধনা যাকে বলা হচ্ছে। কামিনী ও জননী সেখানে এক ভাব। তন্ত্রমতে নারীপুরুষের এই যুগল সাধনের উদ্দেশ্য হল পুরুষের শক্তিমান হওয়া, নারীর শক্তিস্বরূপা হওয়া। তন্ত্রে নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ এমন কোনও ভাবধারা নেই। নারী পুরুষের একক সিদ্ধি কখনওই সম্ভব নয়। সাধকরা বলেন মুক্তি। সাধন হতে সিদ্ধি পর্যন্ত নারী পুরুষ একত্রেই প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্ম করবে। তন্ত্রসাধনায় মদ অনিবার্য। কিন্তু তার স্থান কেবল জাগৃতির আচ্ছন্নতার জন্যে। মাতাল হবার জন্য নয়। ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকের পাল্লায় পরে বর্তমান তন্ত্রক্রিয়া একটা সহজ ভেলকিবাজিতে পরিণত হয়েছে। তা কিন্তু কখনই নয়। তন্ত্রসাধন ক্রিয়ামূলক। মন্ত্রসম্বদ্ধ এতে সংযুক্তি মাত্র। এর বেশি কিছু নয়।

শিব তন্ত্রসাধনার প্রবর্তক। শিব হলেন তান্ত্রিক পুরুষ। আমরা তো এভাবেও ভাবতে পারি শিব অনার্য পুরুষ। কৈলাসে থাকতেন। তন্ত্রক্রিয়া করতেন। হিমালয় আর্যদের বাস। সেখানে পার্বতী থাকতেন। শিব তন্ত্রক্রিয়ার জন্যই পার্বতীকে বিবাহ নয় ভৈরবী করে নিয়ে আসেন। আর্য অনার্য একাকার হয়ে যায়। তন্ত্রক্রিয়ার তাই কোনও জাতপাতের ভেদাভেদ নেই। শুচি অশুচি নেই। সকলের উন্মুক্ত সাধনা এটি। পার্বতী শিবের কাছে চলে এলে আর্যরা ক্ষেপে উঠল। শিবের শক্তি পরীক্ষার জন্য দক্ষযজ্ঞর আয়োজন হল। শক্তি প্রদর্শন করে শিব প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন।

পার্বতীর দেহত্যাগ বিষয়টিকে তো এভাবে দেখা যেতে পারে। ভৈরবী পার্বতীর মৃত্যুর পর ভৈরব শিব তাঁর ভৈরবীর শরীরের একেকটি অংশ একেক দুর্গম স্থানে পুঁতে আসলেন যাতে শিব ভৈরব প্রবর্তিত তন্ত্রধর্মটি শিষ্যদের মারফত সেখানে প্রবর্তিত হয়। শিবের শিষ্যগণ সে সব স্থানে গিয়ে তন্ত্রসাধনা শুরু করে তন্ত্রধর্মের জাগৃতি দিলেন তন্ত্রপীঠ স্থাপন করে। একান্ন পিঠের মিথোলজিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে। তিব্বতীরা সাধকদেহ মৃত্যুর পর কিন্তু বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রেখে অস্তিত্বপিঠ গঠন করেন। ব্যাপারটা আমরা এই ধারণার বশীভূত বলেও মানতে পারি। এরকম মতাদর্শের কথা আমাকে

একবার রামকৃষ্ণ আশ্রমের শংকর মহারাজ বলেছিলেন। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও খানিকটা অন্য আঙ্গিকে এ মত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে তিনি পার্বতীকে ভৈরবী হিসাবে দেখাতে চান নি কখনও। কিন্তু তন্ত্রমতে বিবাহ বিধিসিদ্ধ নয়। তাই আমার মত পার্বতী ভৈরবী ছিলেন অন্তত এই দৃষ্টিকোণে।

এবার ভৈরবীচক্র প্রসঙ্গে আসি। ভৈরবীচক্রে কয়েকজন ভৈবর-ভৈরবী একত্রে তন্ত্রক্রিয়া করেন। সকলেই উলঙ্গ অবস্থাতে থাকেন। ভৈরবরা আসনস্থিত অবস্থাতে থাকেন। ধ্যানজপ চলে। আসনস্থিত অবস্থাতে তাঁরা সম্পূর্ণ পোশাকহীন। সাধারণত অমাবস্যার রাতেই এই ক্রিয়া যোগ চলে। ধ্যানজপ শেষে ভৈরব উঠে দাঁড়ান। ভৈরবী উলঙ্গ অবস্থায় তাঁর সামনে আসেন। ভৈরব ভৈরবীর পাদপূজা করেন। কোলে বসিয়ে কারণ পান করান। পাদপূজার পর বক্ষ, কণ্ঠ, ললাট, যোনিপূজা চলে। একইভাবে ভৈরবী ভৈরবের পাদ, বক্ষ, কণ্ঠ, ললাট, লিঙ্গ পূজা সারেন। দুজনে দুজনের শরীরে চন্দন মাখিয়ে দেন। তারপর ভৈরব ভৈরবীকে কোলে বসিয়ে সাত্ত্বিক ভাবে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হন। এই সঙ্গমে কাম নয় তন্ত্রবলে শক্তির বিচ্ছুরণ উঠে আসে বলে তান্ত্রিকরা মনে করেন। ভৈরবীচক্রে মদ মাৎস্য মাংস আহার চলে। ভৈবর ভৈরবীকে এবং ভৈরবী ভৈরবকে আহার করান। এদের স্ফূর্তি উত্তেজনা সবই সুন্দররহিত হয়ে থাকে। এরা সকলেই সাধনস্থ যোগী হয়ে ওঠেন। বাহ্যজ্ঞান থাকে না কোনও। আলো সাধুর মুখে আমি এরকমটি শুনেছি। তবে বিবরণের রকমফের সবক্ষেত্রেই আছে। ক্রিয়া কর্মতো খানিকটা সাধকগুণে আলাদা রকম হয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, নিগূঢ়ানন্দর লেখাতে এ সম্পর্কে নানা আচার অনুষ্ঠান বিস্তারিত ভাবেই আমরা পাই। প্রমোদকুমারের প্রত্যক্ষ ভৈরবীচক্র দেখবারও অভিজ্ঞতা আমরা পড়েছি। তবে ১৯১৩-১৪ সালে প্রকৃত সাধক দেখার সৌভাগ্য ছিল। তবে প্রকৃত সাধক যে এখন একেবারে নেই তা নয়। তবে উচ্চমার্গের সাধক এখন নেই বললেও চলে। প্রমোদকুমারের সময় বামাক্ষ্যাপা বেঁচে। অনেকে বলেন তারাপীঠের শেষ সাধক শঙ্কর ক্ষ্যাপা। তাঁকে দেখারও সৌভাগ্য হয়নি আমার। আমার শিশুকালেই তিনি দেহ রেখেছেন।

শবসাধনা প্রসঙ্গে এবার কথা বলব আমরা।

(পাঁচ)

দীন-তারিণী, দূরিতবারিণী,সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বাস্বরূপিনী।

তন্ত্রসাধনার মূলই হল শ্মশান। শ্মশান কথার অর্থ হল সবকিছু নাশ বা বিনাশ। তান্ত্রিকরা দেহ থেকে বৃত্তিকে বিনাশ করতে চান। বৃত্তি নাশের সাধনা তাই শ্মশানেই হয়। সাধারণত এঁরা শ্মশান তারা, ধূমাবতীরই উপাসক হন। শবসাধনায় মরার উপর বসে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। তন্ত্রসাধনায় বা সাধারণ যজ্ঞেও হোম করার সময় হোমকুণ্ডের নিচে উদ্দেশ্য অনুযায়ী যন্ত্র এঁকে দেওয়া হয়। এই যন্ত্র শক্তির প্রতীক। সাধারণত একটি সোজা ত্রিভূজ ও তার ওপর একটি উল্টানো ত্রিভূজই আঁকা হয়ে থাকে। যে ত্রিভুজের মুখ নিচের দিকে সেটি যোনি বা প্রকৃতির প্রতীক। উপরের দিকে মুখ করা ত্রিভুজ লিঙ্গ বা পুরুষের প্রতীক। যন্ত্রে এভাবেই কয়েকটি ত্রিভুজ কয়েকটিকে ছেদ করে যায়। ত্রিভুজের মধ্যস্থানে বৃত্ত থাকে। যজ্ঞে যে শক্তিকে আহ্বান করা হয় যন্ত্রগুলি সেই শক্তি অনুযায়ী হয়। এতে লোকের ভাল ও খারাপ করার শক্তি দুইই রয়েছে। যন্ত্র তৈরী হলেই যে তাতে শক্তি বাঁধা পড়বে তা কখনওই নয়। সিদ্ধপুরুষের দ্বারা যন্ত্র বাঁধা হলে তবে তা সম্ভবপর। নচেৎ নয়।

যজ্ঞে যে হোম করা হয় তার উদ্দেশ্য অগ্নিকে জাগানো। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকায় অতীন্দ্রিয় শক্তির জাগরণ। এই শক্তি এলে সাধক দূরদৃষ্টি, দূরঘ্রাণ, দূরশ্রবণ করতে পারেন। যজ্ঞে নারকেল দেওয়া হয় কেন? দেওয়া হয় প্রতীক অর্থে। কলা বেলপাতাও। মানুষের মাথায় ঘিলুর মত নারকেল ভেতরও পদার্থ থাকে। যজ্ঞে নারকেল দেওয়ার অর্থ সাধকের চিৎসত্তাকে চৈতন্যে পরিণত করা। কলা পুরুষাঙ্গ বেলপাতা যোনির প্রতীক। অর্থাৎ সেই ঘুরে ফিরে পুরুষ ও প্রকৃতি।

তন্ত্রমতে ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, হাঁকিনীর অর্থ আছে। ডাকিনী হলেন জ্ঞানী যোগনী। ডাক কথার অর্থ জ্ঞান। শাকিনী হলেন সুবেশা যোগিনী। লাকিনী ক্ষুধাতুরা যোগিনী। হাঁকিনী ভীষণ চিৎকার কারিনী যোগিনী।

অঘোরীরা শবসাধনায় শবদেহের ওপরই সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করেন। তিমির বিনাশী হতে চান সাধক। মোটামুটি এই হল সাধকের ভাষা, সাধনের ভাষা বা সাধনার ভাষা। এখানে তন্ত্রসাধনার ওপরই রচনাটির ভরকেন্দ্র। কারণ হল গিয়ে ভয়। সহজসাধনে ভয় কম। তন্ত্রসাধনে শ্মশান, বীভৎসতা, ভৈরবী, অমাবস্যা এ সব তো যথার্থ ভয়ের প্রতীক। আর আরাধ্যটিও কি কম ভয়ের? তবে তান্ত্রিক সাধনায় বিপদ বা ভয় আসে সিদ্ধির সময়। কারণ যখন সাধনের মহাশক্তির বিকাশ হয় তখন তিনি বিভূতি লাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। এটাই কাল। শুরু হয় অধঃপতন। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলে সাধক দিব্যভাবের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

দিব্যভাব হল কর্মানুষ্ঠানের বিরতি। সম্পূর্ণ মানসিক ও চৈতন্যঘটিত ব্যাপার এটি। এই পথে ভাব সমাধি হয়। রামকৃষ্ণের হয়েছিল। বামাক্ষ্যাপারও। এ সমাধি জড় সমাধি নয়। এই সমাধিতে বিশ্বজগতের এমন কিছু নেই যা সাধক জানতে পারেন না। এই শক্তিবলেই ইষ্টদেবতা দর্শন, আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন, দেবলোক দর্শন, মুক্তিলাভ ইত্যাদি হয়ে থাকে। সাধক জীবনে সিদ্ধি, পরিপূর্ণ সিদ্ধি দিব্যভাব লাভেই। কিন্তু ক'জনে বা সে পথে এগোতে পারেন। করগোনা কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া। তাই এ পথে ঠিকমতো এগোতে না পারলে শিক্ষার্থী সাধকের ভয়ের নির্ঝর আস্ফালন ছাড়া কিছু নেই। তবে ঠগ ভণ্ড ভেলকিধারীদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তারা এ পথের কলঙ্কমাত্র। সব পথেই এরা বিরাজমান। এটাই যা ভরসার।

সিনেমার ভয়, ভয়ের সিনেমা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

All changed, changed utterly
A terrible beauty is born

যদি সিনেমার ভয় নিয়ে কথা বলি তবে এক ধরণের ছবি থাকবে যাতে ভয়ের কথা বলা হয়। যেমন ধরা যাক বাংলায় 'কুহেলী' বা হিন্দীতে 'বিশ সাল বাদ'। এরা ভয়ের কথা বা আতঙ্কের কথা বলে কিন্তু তা অনেকটা শীতের বিকেলে আলোয়ান মুরি দেওয়ার মতন নিরাপদ কেননা শেষ পর্যন্ত আমরা জানি এই ভয়ের এক ধরনের নিরসন থাকবে। ইংরেজী ড্রাকুলা ছবিগুলোর কথাও বলা যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও খ্রীষ্টিয় আশ্বাস বাক্য এত প্রবল যে আমরা ভয় ও ভয়ের অবসান দুই বিষয়েই অবগত থাকায় এইসব আখ্যান হয়ে ওঠে আরামপ্রদ অবসর বিনোদন।

আমি যে ভয়ের কথা বলতে চাই তা এক ধরনের মৌলিক নিষাদ। তা আমাদের অন্তরে হাত রাখে। আমাদের অনুগমন করে। আর আপাতভাবে ভয়ের উপলক্ষ্য অগোচর থেকে গেলেও মনে হয় মুক্তি নেই; এ রকম পতন থেকে পরিত্রাণ নেই। সাহিত্যে এরকম ভয়ের কথা বাস্তবের আবরণে মুড়ে বলেছেন ফ্রান্স কাফ্‌কা। ছবিতে এতভার্দ মুগ, মুগ আতঙ্ক নামের যে ছবিটি আঁকেন সেখানে তুলনারহিত ভয়ের অভিব্যক্তি দেখতে পাই কিন্তু ভয়ের কারণ অজানাই থেকে যায়। কাফকার বিচার পর্বেও দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হলেও অভিযোগ পর্ব খুব পরিচ্ছন্ন নয়। এমনকি দুর্বোধ্যও। বস্তুত এই রহস্যময়তা, ফরাসীরা যাকে মিস্তেরিও বলেন তা যে শ্বাসরোধকারী জলবায়ু সহ আমাদের শরীর ও আত্মাকে বন্দী করে তেমন ভয় ছবির পর্দাতেও হানা দিয়েছিল। লতে আইজনার যে 'Haunted Screen' শিরোনামের বইটি লিখেছেন তা এই ধরনের ভয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। খুব সহজে বলা যায় বিখ্যাত জার্মান অভিব্যক্তিবাদের উৎসই ভয় ও উদ্বেগ। ফ্রয়েডের মত অনুসরণ করলে এক উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে 'আত্ম' নির্মাণে যদি অনিশ্চয়তা দেখা দেয় যদি নিজেকে বিশেষ দেশকালে অভিপ্রেত অবস্থানে চিহ্নিত না করা যায় তবে এক ধরণের ভয়ের উৎপত্তি হয়। এই ভয় সমষ্টিগত ও সমূহ। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে জার্মান জাতিসত্তা এই ধরণের মনোভাবের শিকার হয়। তার থেকেও বড় কথা একদিকে বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও তার অবিশ্বাস্য পতন, ভার্সাই চুক্তিজাত অবমাননা ও মহাদেশব্যাপী ধ্বংসলীলার জন্য অপরাধবোধ জার্মান জাতিসত্তায় সংক্রামিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনোক্রমেই এই পাপবোধের প্রকাশে অনুমতি দেয়নি। ফলে জাতীয় স্তরেই অবদমন কাজ করতে শুরু করে। তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্ত, অভিব্যক্তিবাদ ও বিশেষভাবে কিংবদন্তীতে পরিণত জার্মান এক্সপ্রেসনিষ্ট চলচ্চিত্রসমূহ। যেমন — ক্যাবিনেট অফ ড: ক্যালিগিরি (১৯২০) নসফেরাতু (১৯২২) বা মেট্রোপলিস (১৯২৭)। এই ছবিগুলির কাহিনি যাইহোক এদের গঠন কৌশল দেখে বোঝা যায় যে এরা স্টুডিওর বাইরে যেতে চাইতেন না। শুটিংয়ের সময় তার আপাতযুক্তি যদি বা আলো ও জায়গা ব্যবহারের অসুবিধা হয় তবু প্রধান যুক্তি মোটেই তা নয়। আসলে যুক্তির অন্তরালে যুক্তি এই ছবিগুলির মধ্যে যে অস্বাভাবিক আবহাওয়া, দুঃস্বপ্নের তাড়না তা অন্দরমহলের ধারণা ও তাকে কৃত্রিম স্টুডিওর সেটেই প্রকাশ করা সম্ভব। ছবির শাস্ত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে অভিব্যক্তিবাদের প্রতিনিধিস্থানীয় এই তিন পরিচালক ডাইন, রোনাল্ড ও লাং এসে নির্মাণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা স্বাভাবিকতার থেকে বহুদূরে। সেখানে বাস্তবের শরীর তেমন নয় যেমন সিনেমায় হয়ে থাকে। হলিউডের ছবি এই ছবির সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। তার কারণ এই ছবির দেখাটাই অন্যরকম। এখানে যে কৌণিক রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয় বা লো অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা আলোকসম্পাতে আলোছায়ার যে রীতি তাতে বাস্তব অতিরিক্ত অন্য কোনোও দিগন্তের দিকে দর্শককে প্ররোচিত করা হয়। ক্যাবিনেট অফ ড: ক্যালিগিরিতে একজন যৌন বিকারগ্রস্তের কথা বলা হতে পারে কিন্তু এই বিকার সমগ্র জার্মান জাতিরই বিকার। এই ছবির প্রকৃত নায়ক চিত্রকলা ও আলো। এখানে সৌরলোকহীন স্থান তৈরী করার জন্য যে Chairoscuro আলোক সম্পাত সৃষ্টি করা হয়েছে তার উৎস রেমডান্ট। আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এক ধরণের অপ্রাকৃতিক অনুভূতি তৈরী করা হয় জার্মানরা যাকে বলে Stimmung, মনে রাখতে হবে সিনেমার জনপ্রিয়তা কিন্তু বাস্তবের অনুপুঙ্খ পরিবেশনের উপরে নির্ভর করে থাকে সাধারণত। জার্মান শিল্পীরা যে তার বদলে স্বাভাবিকতা নিরপেক্ষ অথবা বলা ভাল ভীতিপ্রদ জলবায়ু ছবিতে প্রয়োগ করলেন তাতে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী জার্মান জাতির নৈশ গোঙানি ও আর্তনাদ চিরস্থায়ী হয়ে রইল। আখ্যানগুলির দিকে তাকালে বিশেষত ফ্রিজ লাঙের মেট্রোপলিসের দিকে তাকালে বোঝা যায় নাৎসীতন্ত্র আসন্ন। এই ধরণের ভীতিজর্জরিত সমাজ ভয়ের সীমানা পার হতে দৈব নির্দিষ্ট অতিনায়কেরই প্রত্যাশ করে। আর সেই অতিনায়ক ত্রিশ দশকের অ্যাডলফ হিটলার। আমরা যদি অনেক পরে পঞ্চাশ দশকের আটলান্টিক পার হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখি তাহলে আমরা আবিষ্কার করব অন্তত একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে, যিনি ভয়কে প্রায় শকুন্তলার আংটি করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য আমরা আলফ্রেড হিচককের কথা বলছি। আমরা যদি ৫০ দশকে তার বিখ্যাত ছবি Rare Window, Virtigo বা ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সাইকোর কথা ধরি তাহলেই বুঝব

তিনি হরর ছবির মলাটে আসলে মার্কিনি জাতীয় সত্ত্বার অপরাধবোধ, হীনমণ্যতা ও অবদমনকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। ধরা। যাক Rare Window (১৯৫৪) এই যে পেছনের জানলা দিয়ে দেখে ফেলা তাকে দর্শকাম বলা যায়। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ১৯৫৪ সাল মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসে একটি বিশেষ বছর। মানুষের যৌন আচরণ সম্পর্কিত সবচেয়ে বিশ্বাস্য প্রতিবেদন কিনসে রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হল ১৯৫৩ সালে। ৪০ দশকের শেষে যখন কিনসে পুরুষের যৌন আচরণ সম্পর্কিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল তখন মার্কিনি সমাজ অস্বস্তিতে পড়লেও আক্রান্ত মনে করেনি। কিন্তু '৫৩ সালে দ্বিতীয় খণ্ড নারীমনস্তত্ত্বের গোপন প্রদেশে জানা দেওয়ায় মার্কিন পুরুষতন্ত্র অসহায় বলেই আক্রমণাত্মক ও স্থান বিশেষে পৌরুষহীনতার শিকার হল। একদিকে প্রে বয় ম্যাগাজিনের প্রকাশ ও মেরিলিন মনরোর উত্থান অন্যদিকে হিচককের দৃষ্টির সংগঠন আমাদের মনোপ্রবণতার অজ্ঞাত প্রদেশগুলিকে উন্মোচিত করে। আমরা ভয় পাই। আপাতভাবেই ভয়ের উপলক্ষ্য থাকতে পারে। যেমন Virtigo ছবিটি। কিন্তু সাইকো দেখার পরে আমার নিশ্চিত হই যে যৌন বিকারগ্রস্ত ওই যুবক প্রকৃত প্রস্তাব মার্কিন পুরুষের প্রতিনিধি যে আসলে নিজেই ভীত। সর্বনাশের এই উন্মোচন হিচককের সামান্য বাণিজ্যের থেকে চিরকালীন শিল্পীর স্তরে উন্নীত করে। কেননা ভয়ের এই ছবি আমাদের কোনও সুগোল সমাপ্তিতে টেনে নেয় না। প্রতিশ্রুত নিরাপত্তার শিবিরে পৌঁছে দেয় না। বরং আমাদের চেতনায় মুরনাউ বা হিচকক অনন্ত প্রহার। আমাদের মুক্তি নেই। নরকের পথে আমাদের অনন্তযাত্রা আর এই যাত্রার চেতনা হয়ত কোনওদিন আলোর বিন্দুতে আমাদের পৌঁছে দিলেও দিতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় — অ্যাডলফ্ হিটলার; আর ভয় — ইন্দ্রিয়ের উল্লাস।

NEW HEALTH CARE LABORATORY

100A, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD
BHOWANIPUR, KOLKATA - 700 025
Contact No. 98301 59706
2455-0150

ALL PATHOLOGICAL TESTS DONE HERE AT REASONABLE CHARGES

N.B. : Home Collection on request

সত্যজিতের ভয়-নির্মাণ একটি অবলোকন

বিশ্বদীপ দে

কাঠের ওভারব্রীজটা কাঁপছে থর থর করে। ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন রতনবাবু। তাঁর শরীরের ভিতরটাও কেঁপে চলেছে অবিরাম গতিতে। এ কম্পন অবশ্যই ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া যে কম্পন তার চেয়ে পৃথক। এ কম্পনের উৎসস্থল মানুষের মনের গভীরতম কোনও স্তরে। সদ্য ঘটিয়ে ফেলা অপরাধের পরে মানুষের চেতনা জুড়ে অপরাধজনিত এক ধরণের ভয়ের আলো-আঁধারী খেলা চলতে থাকে। এ কম্পন সেখান থেকে উদ্ভুত।

আর, আমরা, পাঠকেরাও কাঁপতে থাকি উত্তেজনায় আর বিস্ময়ে। লেখকের ভাষায় — 'পশ্চিমের মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে — আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক।' সেই মেঘ যেন আমাদের মনের ভেতরটাও মেঘলা করে ফেলে। গল্পের শুরুতে যে নিরীহ মানুষটাকে আমরা ছোট হোল্ডল আর চামড়ার সুটকেস নিয়ে রিকশায় চেপে খোশ মেজাজে চলে যেতে দেখেছি মহামায়া হোটেলের দিকে সেই মানুষটা শেষে কিনা খুন করলেন! তাও কাকে, না মণিলাল মজুমদারকে, যে মানুষটা কিনা হুবহু তাঁরই মতন। গল্পের শুরুতেই আমরা জেনে গেছি অকৃতদার রতনবাবু মানুষ হিসেবে একেবারে একলা। কেন না — 'তাঁর পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারটা সাধারণ লোকের সঙ্গে একেবারেই মেলে না।' এমন নিঃসঙ্গ একজন মানুষ এতদিন বাদে মনের মতন একজন সঙ্গী পেলেন, অথচ তাঁকেই নাকি হত্যা করলেন। মুহূর্তে রতনবাবুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় ভরে যায় আমাদের মন, সেই ঘৃণার তীব্রতা আরও বেড়ে যায় যখন রতনবাবু ভুল করে মণিলাল বাবুর হোটেলে ঢুকে পড়েন এবং পরে নিজের হোটেলে ফিরে গিয়ে সেই ভুল মনে করে হাসেন।

শুধু এখানেই শেষ নয়। 'রাতে পেট ভরে খেয়ে বিছানায় দেশ পত্রিকা খুলে অস্ট্রেলিয়ার বুনো জাতিদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়ে রতনবাবু ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন।' খানিকবাদে তাঁর নাকও ডাকতে শুরু করে দেয়।

এই পর্যন্ত এসে পাঠকমন চূড়ান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে কেবল একা এবং অদ্বিতীয় থাকার প্রবল ইচ্ছেয় একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ব্রীজ থেকে ঠেলে ফেলে দিলেন ট্রেনের সামনে আর তারপর হোটেলে ফিরে 'পরম নিশ্চিন্তে' ঘুমিয়ে পড়লেন? তাও আবার প্রবন্ধ পড়তে পড়তে অনায়াসে! এই ভয়ঙ্কর নির্লিপ্তিই প্রমাণ করে মানুটাকে গল্পের শুরুতে যেমন আত্মমগ্ন মনে হচ্ছিল, তা তাঁর প্রকৃত রূপ নয়। আসলে তাঁর মনের চোরাকুঠুরীতে এতকাল লুকিয়ে বসেছিল এক হিংস্র খুনী। আজ অনুকূল পরিস্থিতিতে তার প্রকাশ ঘটল মাত্র।

এই রতনবাবু যে শেষ পর্যন্ত কৃতকর্মের ফল পাবেনই তা অবশ্য আন্দাজ করা শক্ত নয়। কিন্তু কী করে তা ঘটবে সেটা জানার জন্যই গোগ্রাসে গল্পের পরবর্তী অংশ গিলতে থাকে পাঠক। এবং এখানেই আসল চমক। গল্পের একেবারে শেষে রতনবাবু আবার ফিরে আসেন কাঠের ওভারব্রীজটিতে। এবং আবিষ্কার করেন রেলিং-এর নীচে কাঠের ফাটলে আটকে থাকা একটা সুপুরি এলাচের কৌটো। কৌটোটি মণিলালবাবুর। এই কৌটো গল্পের একেবারে শেষে কী ভয়ঙ্কর চমক উৎপন্ন করবে তা পাঠক বুঝতেও পারে না। তারা শুনতে পায় রতনবাবুর হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে নীচে রেললাইনে সেটা পড়ার 'ঠং' শব্দ। আর দেখতে পায় দূর থেকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে থাকা রেলগাড়ির আলো। ঠিক সেই সময় দমকা হাওয়ায় রতনবাবুর কাঁধ থেকে খসে পড়ে র‍্যাপার। শুনতে পাওয়া যায় ট্রেনের এগিয়ে আসার গুম গুম শব্দ। আর সেই সঙ্গে মেঘের গর্জন। 'যেন একটা ঝড় এগিয়ে আসছে' — রতনবাবুর মনে হয়।

ঠিক এই সময় রতনবাবুর মনে হয় কেউ বুঝি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে ট্রেন দেখতে থাকেন। কিন্তু পাঠক অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার শিঁরদাড়া বেয়ে নেমে যায় আশঙ্কার ঠান্ডা স্রোত।

দু কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন রতনবাবু। ট্রেন দেখার আনন্দে। 'আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে দুটো হাত এসে তাঁর পিঠে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা।' এই ধাক্কা শুধু রতনবাবুর পিঠে নয়, এসে পড়ে পাঠকেরও পিঠে। এক প্রবল ঝাঁকুনি দেয়। ব্রীজ থেকে নীচে পড়ে গেছে রতনবাবুর দেহ। ট্রেনও চলে গেছে। কেবল রেলিং এর কাঠের ফাটলে একটি বস্তু আটকে থাকতে দেখা যায়। সুপুরি এলাচের একটি কৌটো। সে কৌটো রতনবাবুর। পাঠক বুঝতে পারে জীবনের সমস্ত অভ্যাসের মত মৃত্যু মুহূর্তেও মণিলাল-রতনলাল অবিকল একইরকম থেকে গেলেন।

গল্পের নাম 'রতনবাবু আর সেই লোকটা।' লেখক সত্যজিৎ রায়। গল্পের শেষের Twist-কে ফুটিয়ে তুলতে এখানে ব্যবহৃত হল 'দুটো হাত'। গল্পটি মুহূর্তে একটি বিশুদ্ধ হরর গল্পে পরিণত হল। আর পাঠকের মনও গল্পশেষে ঐ সুপুরির কৌটোর মতন আটকে থাকল গল্পের শেষাংশে। এভাবে গল্পটা শেষ হতে পারে পাঠকের কাছে তার আগাম কোনও হদিশ না থাকায় পাঠশেষে যে মুগ্ধতার রেশ জন্ম নিল তা মনের ভিতরে ধীরে ধীরে শিকড় ছড়িয়ে ফেলে এবং থেকে যায় অন্যতম প্রিয় এক গল্প হিসাবে। অসাধারণ এক হরর গল্প হিসাবেও।

(২)

ভয়। কতবার তা উঠে এসেছে সত্যজিতের কলমে? খুব বেশীবার নিশ্চয়ই নয়। তবু ফেলুদা, শঙ্কুর ভীড়ে যে সামান্য ক'টি অসামান্য ভয়ের গল্প হীরকখণ্ডের মতন আজও সমুজ্জ্বল আমাদের মনে, সেগুলিকে নিয়ে দু-চার কথা বলাই এ লেখার উদ্দেশ্য। তবে তার আগে অন্য একটি প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। অনেকের কাছেই 'Ghost Story' এবং 'Horror Story' একই বস্তু। দুটির মধ্যে অবস্থানকারী সূক্ষ্ম সীমারেখাটির সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন একেবারেই। একথা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে আমরা আসলে সত্যজিতের ভূতের গল্প নিয়েই কেবল কথা বলব। আমাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু 'ভয়'। 'ভূত' সেখানে আবশ্যিক-ই এমন নয়।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের ভয়ের গল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুধু 'কঙ্কাল', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' বা 'মণিহারা' নিয়ে আলোচনা করলে কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থাকবে। 'সম্পত্তি সমর্পণ' এর মতন অসম্ভব একটি ভয়ের গল্পকে বাদ দিলে কখনই সেই আলোচনাকে সম্পূর্ণ বলা যাবে না। 'সম্পত্তি সমর্পণ' এ ভূত নেই, কিন্তু হরর রস আছে পূর্ণমাত্রায়। অন্তত 'কঙ্কাল' এর তুলনায় সম্পত্তি সমর্পণ অনেক বেশী ভয়াল তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ঠিক একইভাবে সত্যজিতের 'প্রফেসর হিজবিজবিজ', 'খগম' এর মতন গল্পে 'ভূত' না থাকলেও সেগুলি ভয়াল রসে পরিপূর্ণ। যদিও 'প্রফেসর হিজবিজবিজ'-এ উদ্ভট রসেরই প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় কিন্তু তার ভেতরে নিহিত গোপন ফল্গুর ভয়স্রোতকে অস্বীকার করা যায় না। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় এডগার অ্যালান পো'র 'The System of Doctor Tar and Professor Feather' এর কথা। মূল গল্পের সাথে 'প্রফেসর হিজবিজবিজ'-এর কোনও মিল নেই। কিন্তু মিল রয়েছে অন্য জায়গায়। দু'টি গল্পেই ভয়ের উন্মেষ ঘটিয়েছে উন্মাদ মানুষ। পো-র গল্পে যেখানে মঁসিয়ে মেলার্ড ও আরও অসংখ্য পাগল, সত্যজিতের গল্পে সেখানে প্রফেসর হিজবিজবিজ স্বয়ং ভয়ের উপাদান হয়ে উঠেছেন তাঁর বিদ্‌ঘুটে পাগলামীর প্রদর্শনে। গল্পের কথক হিমাংশু চৌধুরী আধো অন্ধকারে দেখতে পেলেন প্রফেসর হিজবিজবিজের কানের ওপরের অংশ 'গোল না হয়ে ছুঁচোল' এবং তারপরে আবিষ্কার করলেন তাঁকে দেখতে অবিকল 'হযবরল' এর 'হিজবিজবিজ' এর মতন। এই কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন প্রফেসর। এই জায়গায় এসে এক আশ্চর্য ভয় মেশানো অনুভূতি জন্ম নেয় মনে। ক্রমশ কমতে থাকা আলোয় একটা লোক যদি ছিটগ্রস্ত এক বৈজ্ঞানিকের পাল্লায় পড়েন তখন তার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করলে ভয়ে বুক ধুকপুক করে ওঠে বৈকি। তারপর যদি জানা যায় লোকটা 'ভয় পেয়ো না' কবিতার সেই মুণ্ডরধারী অদ্ভুত প্রাণীটি তৈরী করার জন্য একটি আস্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন সেই ভয়ের স্রোত যে আরও দ্রুতগামী হবে, সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? এ গল্পে আরও একটি বিখ্যাত গল্পের ছায়া দেখতে পাই। এইচ. জি. ওয়েলসের 'Island of Dr. Moro' । এবং 'খগম'। এ গল্পেও কোনও ভূত নেই। অথচ এ রকম লোম খাড়া করা ভয়ের গল্প বাংলায় ক'টা লেখা হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইমলিবাবার অভিশাপে তাঁর পোষা সাপ বালকিষণের হত্যাকারী ধূর্জটিবাবু একটি সাপে পরিণত হন। এক কথায় এটাই গল্পের প্লট। কিন্তু অসামান্য নির্মাণ কৌশলে সত্যজিৎ এই রূপান্তরকে উপস্থাপিত করেছেন। কাফকার 'Metamorphosis'-এর গ্রেগরের পোকায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা এক্ষেত্রে মনে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্যজিৎ এখানে কোনও প্রতীক ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ তাঁর একটিই উদ্দেশ্য ছিল — অলৌকিক ভয়াল রসের একখানি গল্প রচনা করা। এতটা নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ তাঁর গল্পের টার্গেট পাঠক কিশোর-কিশোরীরা। ধূর্জটিবাবু একটু একটু করে সাপে পরিণত হচ্ছেন, তাঁর শরীরে দেখা যাচ্ছে 'রুহিতন মার্কা কালসিটের মত দাগ,' বা তার জিভের ভেতর 'একটা সরু লাল দাগ যা ডগা থেকে শুরু করে জিভের মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে।' আর কিশোর পাঠকমন শিউরে শিউরে উঠছে। এবং শেষমেশ আবিষ্কৃত হয় ধূর্জটিবাবুর শরীর মৃতের মতন হিমশীতল। তারপরই 'বাবা ডাকছেন — বালকিষণ! বালকিষণ... বাবা ডাকছেন...' বলতে বলতে নিজের শরীরটা টেনে হিঁচড়ে তিনি খাটের তলায় অন্তর্হিত হন। এ পর্যন্ত পড়ে পাঠকের অবস্থাও হয় কথকেরই মতন। 'যেটা অনুভব করছি সেটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক মেশানো একটা অদ্ভুত ভয়াবহ ভাব।' অবশ্য কিশোরমনের কথা বলছি বলে একথা ভাবার প্রয়োজন নেই যে বড়রা পড়ে ভয় পাবে না। আট থেকে আশি সকলকে ভয়াল রসে মজিয়ে রাখার ম্যাজিকাল ক্ষমতা ছিল সত্যজিতের কলমে, সে কথা নতুন করে বলবার কি খুব প্রয়োজনীয়তা আছে? কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না মূলত ছোটদের জন্যই তিনি লিখতেন। ভয়ের গল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

(৩)

বিশুদ্ধ ভূতের গল্পও সত্যজিত লিখেছেন দারুণ সাফল্যের সঙ্গে। 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি', 'ফ্রিৎস', 'বাদুড় বিভীষিকা', 'অনাথবাবুর ভয়', 'ভূতো' — এগুলির নাম আলাদা করে করতেই হবে। তবে 'ভূতো' নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভয়াবহ ভৌতিক গল্প। ম্যাজিশিয়ান নবীন এবং তার পুতুল ভূতো এবং অবশ্যই ম্যাজিশিয়ান অক্রুর চৌধুরী এ গল্পের প্রধান তিন চরিত্র। হ্যাঁ, ভূতো 'পুতুল' হয়েও 'চরিত্র', কেন না তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। করেছেন অক্রুর চৌধুরী। প্রতিশোধস্পৃহায় অন্ধ নবীন নিজের হাতের পুতুল ভূতো কে গড়ে তুলেছিল অক্রুর চৌধুরীর অনুকরণে। নবীনের চেয়ে অনেক বড় মাপের যাদুকর অক্রুর তা মানতে পারেননি। ফলে নবীনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ভূতোকে 'জীবন্ত' করে দিলেন। এবার আর শুধু চেহারায় মিল নয়, ভূতো হয়ে উঠল অক্রুরবাবুর খুদে জীবিত এক সংস্করণ। সে আর নিছক হাতের

পুতুল হয়ে রইল না। শেষ ভাদ্র মাসের এক ' ট্রাফিকবিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে' ভূতোর মুখ থেকে ছিটকে বেড়িয়ে আসে ক্রুদ্ধ গর্জন — 'ভূতো নয়! আমি অক্রুর চৌধুরী।' এর পরই ভূতো মারা যায়, কেন না অক্রুর চৌধুরীও যে ঢলে পড়েছেন মৃত্যুর কোলে। সময়টা দু'জনের ক্ষেত্রেই এক। বারোটা বেজে দশ মিনিট।

'ফ্রিৎস' গল্পটিও পুতুলের জীবন্ত হয়ে ওঠার কাহিনী, কিন্তু 'ভূতো'-র ধারেকাছে আসে না। 'বাদুড় বিভীষিকা' গল্পে আর 'পুতুল নয়, এখানে বাদুড় হয়ে উঠেছে গল্পের প্রধানতম ভয়ের উপাদান। জগদীশ পার্সিভ্যাল মুখার্জী নামের এক আধপাগলা খ্রীষ্টান প্রতিদিন রাতে বাদুড় হয়ে যান। গল্পটির প্রতিটি অংশে পাশ্চাত্য ভুতুড়ে গল্পের ছায়া। কবরখানা, চার্চ, পাদরী — এইসব উপাদান থাকায় গল্পটির তথাকথিত বাঙালীত্ব অনেকটাই ক্ষুন্ন হয়েছে। তবে গল্পটি যে বেশ ভীতিপ্রদ সন্দেহ নেই। জগদীশের একটা ভয়াল সংলাপ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

— 'এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বছরের পর বছর বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে, এদের অতৃপ্ত বাসনার কথা কি আপনি জানেন? এরা কি কেউ এইভাবে বন্দী থাকতে চায়? কেউ চায় না। সকলেই মনে মনে ভাবে — একবারটি যদি বেড়িয়ে আসতে পারি!'

'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি'ও গল্প হিসেবে পাশ্চাত্য গল্পের ভারতীয় সংস্করণ। 'অনাথবাবুর ভয়' এবং 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি' দুটিই পোড়োবাড়ির গল্প। কিন্তু গল্প দুটির পরিবেশ এক নয়। 'অনাথবাবুর ভয়' গল্পে অম্বুরী তামাকের গন্ধ, টানা পাখা নিয়ে এসেছে বাংলার জমিদারী আমলের প্রত্যাবর্তনের ভৌতিক মেজাজ, 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি' গল্পটিতে দেখা যায় জন মিড্‌লটন ব্রাউন এবং পোষা বিড়াল সাইমনকে। তারা বাস করত এভারগ্রীণ লজে। সত্যজিতের ভাষায় 'এভারগ্রীণ লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংলন্ডের কোন গ্রামাঞ্চলের একটা পুরোন পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।' সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে পরিবেশগত দিক থেকে দুটি গল্প দু' রকমের। যদিও গল্প হিসেবে দুটিই যথেষ্ট ভয়ঙ্কর!

(৪)

আরও বেশ কিছু অসাধারণ লেখার কথা মনে পড়ছে। 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'নীল আতঙ্ক', 'অঙ্ক স্যার', 'গোলাপী বাবু আর টিপু' অথবা তারিণীখুড়োর বেশ কিছু গল্প— এদের নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করা যেত। কিন্তু এই সামান্য পরিসরে তা সম্ভব নয়। তবে এই সব গল্পে হরর রসের যে ধারা পরিবাহিত তার প্রতিনিধিত্বমূলক অন্য গল্প (সম্ভবত শ্রেষ্ঠতরগুলিই) নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে চাই।

ও হ্যাঁ, আরও একটি ধারার কথা মনে পড়ছে। শুরুতে আমরা আলোচনা করেছিলাম 'রতনবাবু আর সেই লোকটা' এর কথা। গল্পটিতে 'ভূত' এসেছিল একেবারে শেষে। তার আগে বোঝাই যায় নি গল্পটি ভৌতিক গল্প। ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটেছে 'মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি' গল্পে। আগাগোড়া গল্পটি ভৌতিক আবহে রচিত। অথচ একেবারে শেষে জানা যায় গল্পটি মোটেই ভৌতিক নয়। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় 'সহদেববাবুর পোট্রেট' গল্পেও। একেবারে শেষে জানা যায় যে জমিদারের ভূতুড়ে ছবি ঘিরে এত কাণ্ড তা আসলে কোনও সত্যিকারের জমিদারের ছবিই নয়! তবে শেষের একটু আগে পর্যন্ত গল্পদুটি টানটান ও লোমহর্ষক। এটিও সত্যজিতের এক অনন্যসাধারণ স্টাইল।।

তবে সত্যজিতের সমস্ত ভয়ের গল্পই যে চিরকালীন বা বহুবার পড়বার পরেও আকর্ষণ কমে না-তা বলা যায় না। অবশ্য তেমনটা আর পৃথিবীর কোন লেখক সম্পর্কেই বা বলা যায়! 'টেলিফোন', 'আমি ভূত', 'রামধনের বাঁশী', 'লাখপতি' ইত্যাদি গল্পে আগের সেই ম্যাজিকাল টাচ্ অদৃশ্য। গল্পগুলি নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু 'খগম', 'ভূতো' কিংবা 'গগন' চৌধুরীর স্টুডিও'-এর পাঠকের মনে তা আলোড়ন জাগাতে অক্ষম।

তবে সব মিলিয়ে বাংলা ভয়াল রসের গল্পে সত্যজিৎ প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'প্রায়' বললাম। রবীন্দ্রনাথ আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন যে! রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আগেই বলেছি। শরদিন্দুও 'টিকটিকির ডিম' বা 'কালো মোরগ' এর মতন ভয়ের গল্প লিখে বসে আছেন। তবু একথা বলা চলে, সত্যজিতের পথ এঁদের পথের চেয়ে আলাদা। বাংলা সাহিত্যে ভয়ের গল্পে তিনি এক নতুন পথের দিশারী। পরবর্তী সময়ে অনেক লেখক সে পথে হাঁটতে চেষ্টা করলেও তাঁর আগে এই পথ অনাবিষ্কৃতই ছিল। নিজের ব্যস্ততাভরা জীবনের প্রবল চাপ সামলে, তারপর ফেলুদা-শঙ্কুর চাহিদা পূরণ করেও এমন এক নতুন ভয়-সড়ক-নির্মাণ করে গেছেন সত্যজিৎ যা আজও আমাদের ভীত, শিহরিত, আনন্দিত ও মগ্ন করে রাখে।

প্রসঙ্গ গথিক নভেল

সুদীপ চক্রবর্তী

ভয়ের জন্ম অজানার গর্ভে। বেকনের মতে আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই যেভাবে একটি বাচ্চা অন্ধকারকে ভয় পায়। ভয়ের মনোবিজ্ঞানকে অধিকাংশ সময়েই সীমানাহীন পাঠ্যক্রম মনে করা হয়। কেননা মনের মত ভয়ও সীমানাহীন। অ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিসের ধারণা অনুযায়ী মঞ্চায়নের ফলে দর্শকমনে দুঃখের পাশাপাশি ভয়েরও সঞ্চার করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এক্ষেত্রে এক ধরণের বিশেষ ভয়েরই মোক্ষণ ঘটে মাত্র। সে অসংখ্য অনুল্লিখিত ভয়ের বাস আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মনোজগতে, তার ব্যাখ্যা ক্যাথারসিসে মেলে না। মানুষ যতই যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক হোক না কেন এই অজানা ভয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। যেখানে সাহিত্য অনেক সামান্য ঘটনার মধ্যেও অসামান্য খুঁজে পায় তাই একথা বলা যায় যে সাধারণ ঘটনার অনুষঙ্গেও ভয়ের সূত্র গোপন থাকে। আর তাই সেইজন্যই আমরা প্রত্যেকেই ভয়ে বাস করি। এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা ক্যাথারসিসে নেই। সাধারণ মানুষের কল্পনাপ্রসূত ভূত ভাবনা এক বিশালাকার ভয়বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

যেখানে রহস্য গল্পগুলি চেষ্টা করে অজানা, অচেনা রহস্যজনক ঘটনাগুলিকে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সেখানে অলৌকিক গল্পগুলি শেষপর্যন্ত অবাখ্যাত উপাদানগুলিকেই প্রকাশ করে। যেমন 'হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস্' উপন্যাসে শার্লক হোমস এক শতাব্দী প্রাচীন ভূতুড়ে ঘটনাকে যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করে এর মধ্যে লুক্কায়িত অপরাধপ্রবণতাকে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। পাশাপাশি এডগার অ্যালান পো এবং গী দ্য মঁপাসার রচনা ভয়ের মাত্রা অনেক বেশী। এঁরা তাঁদের লেখায় যুক্তি এবং উন্মাদনার মিশেল ঘটিয়েছিলেন ভয়ের উত্তুঙ্গ উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য। এই ভয়, অর্থাৎ অজানার ভয় আনন্দদায়ক কেননা তা উত্তেজক এবং অ্যাডভেঞ্চারকে উস্কে দেয়। যদিও তা একটি সীমা পর্যন্তই। কেননা এরপরই এতে বিপদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটে। কোনান ডয়েলও শেষপর্যন্ত শার্লক হোমসের গল্পের শীতল যুক্তি থেকে ক্রমশ সরে এসেছিলেন অতিপ্রাকৃতের দিকে।

পাশ্চাত্যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের অতি প্রাবল্য এক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। শিল্প বিপ্লব তখন সবে শুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞানও তার বিস্ময়কর রূপ পরিগ্রহ থেকে অনেকটা দূরেই অবস্থান করছিল। পরবর্তী ১৫০ বছরে বিজ্ঞান মানুষকে এই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে যুক্তির সাহায্যে ভয়কে দূরীভূত করা যায়। এমনকি সাইকোঅ্যানালিসিসের সুবর্ণ সময়ে একথা প্রমাণিত, স্বপ্ন, তা সে যত ভয়েরই হোক তার ব্যাখ্যা করা যায় এবং তার অবস্থান মানুষের মনের আলো-আঁধারী অঞ্চলে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর উত্থান-পতন এটাই প্রমাণ করে যে বিজ্ঞান এখনো পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে নি। আলোকপ্রাপ্ত সময় তার বোঝাকেও বয়ে নিয়ে চলেছে। সমস্ত কিছুকে শ্রেণীকরণের প্রক্রিয়াকে সব সময় মোটেও সমর্থন করা যায় না। এত সত্ত্বেও আমাদের আহৃত জ্ঞান ঘটনাকরণের ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত নয়। ফলত মনের গহনের স্বত্চলাচল অধরাই থেকে যায়। লক্, হবস্, ভলতেয়ার, রুশো এবং বেন্থাম—এদের মনস্বীতাও কখনো চূড়ান্তভাবে এই কার্যকারণভিত্তীকতাকে সুস্পষ্ট নির্ধারণে বাঁধতে পারে নি। অতএব আমরা সহজেই উপনীত হই রোমান্টিসিজম নামে সেই সোনার পাথর বাটিতে যা এর থেকে সৃষ্ট সংকট থেকে আপাতমুক্তি দিতে পারে। অতএব এল অজস্র কল্পনার মেঘমালা নানা আকৃতির, বর্ণের ও অনুভূতির ভয় তার এক বিশেষ রূপবর্ণ ও অনুভূতি মাত্র।

মধ্যযুগীয় গথিক স্থাপত্য (১১০০-১৩০০) বলতে বোঝায় স্থূল দেওয়ালবিশিষ্ট অট্টালিকা যার জানলাগুলি সংকীর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর গভীর ভল্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হঠাৎ গথিক স্থাপত্যের প্রতি মানুষের কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। কেননা এই বাড়িগুলি ছিল রহস্যের আঁতুড়ঘর।

লর্ড হরেস ওয়ালপোল (১৭১৭-৯৭) ছিলেন প্রথম বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি এটন এবং কেমব্রিজের শিক্ষাশেষে ১৭৪১ সালে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টে তাঁর সক্রিয় অবস্থান ছিল। ১৭৪৭ সালে তিনি টুইকোনহ্যামে একটি ছোট বাড়ি কেনেন এবং তার নাম দেন স্ট্রবেরী হিল। গথিক স্থাপত্যকে ব্যবহার করে তিনি এই বাড়িটির পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণের পর সেটি সেই সময়ের বিখ্যাত বাড়িগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তিন হাজারটি চিঠি লেখেন যা তাঁকে অমর করে রেখেছে। সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'দ্য কাসেল অফ অট্রান্টো' (১৭৬৪) । এটিই হল প্রথম গথিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অন্য লেখকদেরও এই ধারাতে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই উপন্যাসের কাহিনীকে মধ্যযুগীয় জীবন প্রবাহের অনুবাদ। এই উপন্যাসে আমরা খুঁজে পাই প্রতিহিংসা, হত্যা, রাজনৈতিক কলাকৌশল, কামনা ইত্যাদি যা প্রকাশিত হয়েছে আমাদের কল্পনাপ্রসূত মধ্যযুগীয় গথিক দুর্গের সুড়ঙ্গে, গোপন কক্ষে। এই সমস্ত অনুষঙ্গ আজকের ভয়ের সাহিত্যেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়ালপোল মনে করতেন গথিক উপন্যাস হল 'a constant vicissitude of interesting passions.'

উপন্যাস সেই সময় তুচ্ছ হিসাবে গণ্য হতো। সিরিয়াস সাহিত্যের আঙিনায়। স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ্ উপন্যাসকে মনে করতেন—'mental camera obscura, manufac-

tured at the printing office', এবং কোলরিজ্ আরো বিশ্লেষণাত্মক হয়ে বলেছেন — 'moving phantasm of one man's delirium'। ওয়ালপোলের আবির্ভাবের সময় থেকে শতবর্ষব্যাপী সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে উপন্যাস বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যখন সেই মানুষেরা নিজেদের জীবনে অর্থনৈতিক প্রভাব অনুভব করে। বই কিনে পড়া ব্যায়সাধ্য হয়ে পড়ায় ১৭২৬ সালের শুরু থেকে লাইব্রেরীতে বই পরিবেশনের উদ্যোগ তৈরী হয়। বলা যায় সেই মুহূর্ত থেকেই ওয়ালপোলের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। প্রথমে মনে করা হয়েছিল এই জনপ্রিয়তা সত্যিকারের ভালো অনুবাদের ফসল। পরবর্তীকালে সত্যি প্রকাশিত হয়। এবং গথিক সাহিত্যের প্রতি মানুষের পাগলামির সূত্রপাত হয়।

ওয়ালপোলকে অনুসরণ করে অনেক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল মহিলা। এঁদের মধ্যে অনেকেই গথিক উপন্যাস লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন নিজের এবং পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক সুরাহার সন্ধানে। শার্লট স্মিথের জীবন একটি বড় উদাহরণ। ঋনের বোঝা থেকে তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ইংল্যান্ডে পালানো প্রয়োজন ছিল। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। গথিক উপন্যাস লিখে সেই বই বিক্রির টাকায় তাঁরা ইংল্যান্ডে চলে আসতে সক্ষম হলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে সেই প্রথমবার মহিলারা সাহিত্যের আঙিনায় পদার্পণ করেন। গথিক উপন্যাসের কোথায় কোথায় ভয় এবং আতঙ্ক উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সম্পর্কিত তর্ক সফলভাবে উত্থাপিত হয় এই মহিলা সাহিত্যিকদের লেখায়। প্রথমবার গথিক উপন্যাস লেখায় সিরিয়াস পদক্ষেপ দেখা যায় মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে। যার পুরোভাগে ছিলেন জেন অস্টিন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৫। অস্টিনের প্রথম উপন্যাস 'নরদ্যাঙ্গার অ্যাবে' লিখিত হয় ১৭৯৮-৯৯ সাল নাগাদ। এরপর লেখাটি বহুবার পুনির্লিখিত হয় এবং শেষ অবধি প্রকাশিত হয় অস্টিনের মৃত্যুর এক বছর পরে। সঙ্গে অস্টিনের আরেকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তার নাম 'পারসুয়েসন'। অস্টিনের 'নরদ্যাঙ্গার অ্যাবে' উপন্যাসে নায়িকা মোরল্যান্ড গথিক উপন্যাসের তীব্র অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নর্দান অ্যাবেতে আমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁর কাছে নর্দান অ্যাবে নামটি খুব আকর্ষণীয় ছিল। তিনি দেখেন নর্দান অ্যাবে একটি আধুনিক বাড়ি এবং সেখানে জেনারেল টিলনে এবং তাঁর পরিবার বসবাস করতেন। টিলনের ছেলে রেভারেণ্ড হেনরি নায়িকা মোরল্যাণ্ডের মন থেকে গথিক নভেলের প্রতি বাষ্পীভূত অনুকম্পন দূরীভূত করেছিলেন।

ওয়ালপোলের উত্তরসূরীদের মধ্যে যে সব মহিলা সাহিত্যিকেরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরা হলেন— অ্যান র‍্যাডক্লিফ (১৭৬৪-১৮২৩), শার্লট স্মিথ (১৭৪৯-১৮০৬), ক্লেরা রীভ (১৭২৯-১৮০৭), ফ্রান্সেস 'ফানি' বার্ণি (১৭৫২-১৮৪০), এবং মারিয়া এজওয়ার্থ (১৭৬৭-১৮৪৯), পুরুষ সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা গথিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন — ম্যাথু গ্রেগরী 'মঙ্ক' লিউইস (১৭৭৫-১৮১৮), উইলিয়াম বেকফোর্ড (১৭৫৯-১৮৪৪), এবং চার্লস রবার্ট ম্যাচুরিন (১৭৮২-১৮২৪)

সমস্ত রহস্য গল্পের মধ্যেই গথিক উপন্যাসের ধারা পরিলক্ষিত হয়। ভয়ের এই রূপরেখা জেন অস্টিনের বাস্তববোধ এবং প্রহসণে জায়মান ছিল। এমনকি শার্লট ব্রন্টির (১৮১৬-৫৫) 'জেন আয়ার' (১৮৪৭) এবং এমিলি ব্রন্টির (১৮১৮-৪৮) 'উদারিং হাইটস' (১৮৪৭) ভয়ের এই উপজীব্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভয়ের এই অনুরনণ সঞ্চারিত হয়েছে কিছু নলবদ্ধ ধারণায় আর কিছু বহুমাত্রিক দৃশ্যে। যেমন — অন্ধকার ঘরের শীতলতা, হারিয়ে ফেলা পুরনো কিছু দুঃখের রোমাঞ্চকর পুনআবিষ্কার, বদ্ধ ঘর, শুনশান প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি, গথিক উপন্যাসের প্রতি এই অনুরাগ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ছাপার অক্ষরের গণ্ডি পেরিয়ে তা শব্দদৃশ্যময় শিল্পকলাতে স্থান করে নিয়েছে। পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ভয়ল আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গী। আমরা বিশ্বাস করি যে ভয় আমাদের চেতনায় ও অবচেতনে গ্রন্থিত আছে। কখনো তা চলচ্চিত্র, কখনো গথিক উপন্যাস কিংবা অন্যান্য সাহিত্যধারার ধমনীতে সঞ্চারিত হয়। এবং আমরা ভয় পাই।

ভূতের পৌরাণিক উপকথন

শামিম আহমেদ

ফুল চালিতে আঁচল চালি
আরও চালি শিব
চারকোণ পৃথিবী চালি দেব দানব জীব
গাছে থাকোস দোহাই রামের
আমার দোহাই পেল্যা যদি
না আহোস, সুলেমান নবির মাথা খাও
মিষ্টি সুরে কথা কও।

ভূত নামানোর এই মন্ত্রটি বাংলাদেশের বিখ্যাত এক কবিরাজের কাছে পেয়েছেন আমাদের এক বন্ধু। মূলধারার লিখিত সাহিত্যে ভূতেদের যে উপদ্রব, তা বিবৃত করা এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। বরং যে সব লৌকিক সাহিত্য সেভাবে বিখ্যাত নয়, বা বলা ভাল ভূতেদের লেখা যে সাহিত্য, সেখানে তাদের চিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে, সেটাই দেখা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব, ভূত শব্দটার অর্থ কী, কীভাবে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। হঠাৎ কোনো একজন 'ভূত' দিয়ে তমুক বস্তুকে বোঝাতে শুরু করলেন, ভারতীয় শব্দার্থতত্ত্বে এমন বিষয় চট করে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 'ভূত' শব্দটির ৮টি করে প্রাথমিক অর্থ বা মুখ্য অর্থ আছে। সংঘটিত আপতিত ; জাত ; বৃত্ত, অতীত; সত্য; যুক্ত, ন্যায্য; সম, সদৃশ; চির (বৈজয়ন্তী); প্রাপ্ত, লব্ধ। 'ভূত' শব্দের অন্তত ১৪টি গৌণ অর্থ আছে। 'ভূত'-এর মূলীভূত ধাতু ভূ-এর মানে উৎপন্ন বা জাত। যা উৎপন্ন বা জাত হয় তাই ভূত। এই হিসাবে পাঁচ ভূত বা বারো ভূত নামক প্রবাদের অর্থ বেশ মূর্ত হয়ে ওঠে। বৈয়াকরণের কাছে 'ভূত' নিয়ে যতই কচকচি থাক না কেন, জনস্রোতের চলমান অর্থ নিয়েই বৈয়াকরণ বা অভিধান-প্রণেতা কাজ করেন। ফলে, 'ভূত' শব্দটির বুৎপত্তি নিয়ে কেউ একটা বড়সড়ো কাজ করতে পারেন। অন্তত সেই সুযোগটা রয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্যে ও মহাকাব্যে 'ভূত'-দের দেবযোনির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। দেবযোনি দশ প্রকারের হয় — বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত। ভূত নামক দেবযোনিদের প্রচুর ঐশ্বর্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। এদের জন্ম দেবতা থেকে হলেও এরা দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণী।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, ভূতের দ্বারা যদি কেউ অভিভূত হয় তাহলে যেমন তার কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না, ভূতের ইচ্ছাতেই সে চলতে থাকে, রণক্ষেত্রে যোদ্ধারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যেন সেইরূপ অন্য পরিচালিত হয়েই যুদ্ধ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে বনপর্বের নলরাজার উপাখ্যান স্মরণীয়। তার দেহে কলির অবস্থানকে ভূতাবেশের নিদর্শন বলেই ধরা হয়।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর থেকে ফেরার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কলির দেখা হয়। কলি দেবতাদের বললেন, দময়ন্তীকে পাওয়ার ইচ্ছা তাঁরও আছে। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ম্বর হয়ে গিয়েছে। দময়ন্তী নল রাজাকে বিয়ে করেছে। এতে কলি ক্রুদ্ধ হয়ে নলের দেহে অধিষ্ঠিত হওয়ার সংকল্প নেন। উদ্দেশ্য, নলকে ভ্রষ্ট করা। নিষধরাজ্যে এসে কলি নলের ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। বারো বছর কেটে যাওয়ার পর কলি দেখলেন, নল মূত্রত্যাগের পর পা না ধুয়ে শুধু আচমন করে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। এর পর নল রাজার সঙ্গে তাঁর ভাই পুষ্করের বিরোধ, নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ এবং নলের ককৌটক নামে রূপান্তরের কাহিনি সুবিদিত। এই ভূতাবেশ বা কলির ভর নামে অদ্ভুত উপায়ে। নল যে ককৌটক নামে রূপান্তরিত হলেন, তার পরে কলি ককৌটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হাতজোড় করে নলকে বললেন, রাজা আমাকে অভিশাপ দিও না। যে লোক তোমার নাম সংকীর্তন করবে তার কলিভয় বা ভূতের ভয় থাকবে না। এর পর কলি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করলেন।

লৌকিক মতানুযায়ী, নল দিয়েই নাকি ভূত ধরতে হয়। নলের এক দিকে ভূত ধরে অন্য দিকে ছেড়ে দিলে সন্তাপ দূর হয়, বিরূপতা কাটে। অবশ্য ভূতদের বোতলবন্দী করার কথাও শোনা যায়। যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব প্রমুখ দেবযোনিরা যেমন কোনও কোনও সম্প্রদায়ের কাছে পূজিত হতেন, তেমনি মহাভারতের বনপর্বে ভূত নামক দেবযোনিকেও পূজিত হতে দেখা যায়। ভূতেদের প্রসাদে নানাবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয় এবং পূজক প্রভূত সম্পদ লাভ করেন — এই ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল। অর্কপুষ্প, জলজ পুষ্পের মালা প্রভৃতি বস্তু ভূতেদের বিশেষ প্রিয়।

অর্কপুষ্পেস্তু তে পঞ্চ গণাঃ পূজ্য ধনার্থিভিঃ।...
জলজানি চ মাল্যানি পদ্মাদীনি চ যানি বৈ।
(বনপর্ব ও অনুশাসন পর্ব, মহাভারত)

লৌকিক ভাষায় 'ভূত চালা' হল দেহ থেকে ভূত চালিত করা বা ভুত ঝাড়া। 'ভূতচালা'-র আরেকটি মানে হল ভূতের চালক বা ওঝা। এই ওঝারা ভূতহারক বা ভল্লাতক নামেও অভিহিত। সর্ষপ মরিচ প্রভৃতি সহযোগে ভূত তাড়ানোর কথা লৌকিক ছড়া ও গানে পাওয়া যায়।

'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করা' — এই প্রবাদটি বাংলা ভাষায় রয়েছে। বিফল কাজকে বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। আত্মবোধে পঞ্চভূতাত্মা দেহের নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করাকে কেউ কেউ 'ভূতের বেগার খাটা' নামে অভিহিত করে থাকেন।

একটি রমাপ্রসাদী গানই আছে — 'মরলাম ভূতের বেগার

খেটে।' বৃথা কাজ করাকে 'ভূতের বোঝা বওয়া' বলেন কেউ কেউ। 'ভূত' শব্দটি দিয়ে বহু বাংলা শব্দ রয়েছে। 'ভূত' শব্দ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য শব্দও রয়েছে এখানে-ওখানে।

'ভূতপূর্ব' শব্দটি অভূতপূর্ব নয়। ভূতভাবন, ভূতযোনি, ভূতরায় শব্দগুলো অচেনা হলেও ভূতশুদ্ধি কথাটা বেশ পরিচিত — 'ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি (ভারতচন্দ্র)'। ভূতশুদ্ধিতে পূজারী মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে হৃদয়স্থ দীপবালিকার জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে ষটচক্র ভেদ করে শিরস্থ সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তখন ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 'ভূতসর্গ' 'ভূতাত্মা', 'ভূতাদি', 'ভূতাধীশ' (শিব), 'ভূতানুকম্পা', 'ভূতান্তক', 'ভূতার্থ', 'ভূতাবাস', 'ভূতেশ', 'ভূতুড়ে' ইত্যাদি শব্দের অজস্র ছড়াছড়ি।

বাংলার ধর্মসংস্কৃতিতে ভূতের যে চর্চা তা শুধু সংখ্যাগুরুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ইসলাম ধর্মেও 'জার' নামের একটি ধারণা আছে যারা অসুস্থতা, বিদ্রোহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটাতে পারঙ্গমা। 'জার' নামক যে সত্তার কথা ভাবা হয় তা মহিলা। এ ছাড়া 'জিন' নামক যে প্রত্যয়ের কথা এই ধর্মে আছে — তা ফেরেশতা ও মানুষের এক তৃতীয় সত্তা। জিনকে দেখা যায় না — ধোঁয়াহীন আগুন থেকে জিনের সৃষ্টি। জিনভূত নিয়ে আরব সাহিত্যে অসংখ্য লেখালেখি আছে। বাংলা ভাষাতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখাতে আমরা জিনদের রোমহর্ষক কাহিনি শুনতে পাই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প ''জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল'' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই নিবন্ধের ইতি টানবো।

''ডাইনে সালাম ফিরাইয়া বামে সালাম ফিরাইতে গর্দান ঘুরাইচি তে দেহি আমার বগলে নমাজ পড়ে বুড়া এক মুসল্লি তাজিম কইরা পাওয়ের দিকে দেখলাম। বুইড়া মিয়ার পাওয়ের দিকে দেখছি তো, নজরে পড়লো পাওয়ের পাতা দুইখান। হায় হায়! পাওয়ের পাতা দুইখান তার পিছন দিকে।

আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনেরা আপনাগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?

এই কথায় তারা খুব রেগে বুলেটের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পায়ের পাতা তাদের পেছন দিকে থাকায় তারা যতই হাঁটে বুলেটের কাছ থেকে ততই সরে যায়।

ভয় দেখাতে ভালোবাসি, ভয় পেতে ভালোবাসি অদ্রীশ বর্ধন

[একটা বহু পুরনো বাড়ির রহস্যময় আলো আঁধারী ল্যান্ডিং। দরজার বাইরে নেমপ্লেট দেখে বুঝেছি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আকৈশোর যাঁর লেখনী সম্মোহিত করে রেখেছিল সেই অদ্রীশ বর্ধন এ বাড়িতেই থাকেন। এটাই সেই ৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন। এখান থেকেই ছেপে বেড়িয়েছে ভারতবর্ষের প্রথম সায়েন্স ফিক্‌শন পত্রিকা 'আশ্চর্য'। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সত্যজিৎ রায় — কেউই আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি আছেন। অদ্রীশ বর্ধন। বাংলা সায়েন্স ফিকশনের আদি যুগের শেষতম পথিকৃৎ। জীবন্ত কিংবদন্তী মানুষটির কলম আজও চলছে সমানতালে। সত্যজিৎ রায়ের আশীর্বাদধন্য এই মানুষটির উদ্যোগেই পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটির জনকও তিনিই। পাশাপাশি অ্যালান পো, লাভক্র্যাফটের গা ছমছম রচনাগুলিকেও বাংলায় সার্থক রূপায়ণ তিনিই করেছেন। জুল ভের্নের রচনাবলী বা শার্লক হোমসের অনুবাদ — এতেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই। সেই প্রবাদপ্রতীম মানুষটির মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর লেখা মৌলিক ভয়ের রচনাগুলি বা অনুদিত বিদেশী ভুতুড়ে গল্পগুলি নিয়ে কথা বলার। কিন্তু আলোচনায় উঠে এল তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল জীবন। 'আশ্চর্য' এর প্রকাশ থেকে শুরু করে পো, লাভক্র্যাফট হয়ে সত্যজিৎ রায় — সব বিষয়েই সাবলীল আড্ডা দিলেন অদ্রীশ বর্ধন।]

অদ্রীশ বর্ধন : এটা কী বাবা?

বিশ্বদীপ আপনার কথাগুলো রেকর্ড করে নিচ্ছি।

অদ্রীশ বর্ধন এইটুকু টেপ রেকর্ডার! আহ! কোথায় পৃথিবী চলেছে। ক্রমশ অণু থেকে পরমাণু হয়েই যাচ্ছে।

দীপ আপনার প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যা করে তার তুলনায় এ তো কিছুই না।

অদ্রীশ বর্ধন আমরা যা ভিসুয়ালাইজ করতে পেরেছিলাম বর্তমান বিজ্ঞান তাকে টপকে অনেকদূর চলে যাচ্ছে। আমি বউমাকে সেদিন বলছিলাম কল্পবিজ্ঞান একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান বিজ্ঞান তাকেও টপকে চলে যাচ্ছে। যেমন — ইন্টারনেট।

বিশ্বদীপ : আমরা ছোটবেলা থেকে আপনার লেখা এত পড়েছি মানে সে গোয়েন্দা গল্প থেকে শুরু করে কল্পবিজ্ঞান, ভয়ের

অদ্রীশ বর্ধন : আমি কিন্তু লিখতাম মনের আনন্দে।

দীপ : আমরাও খুব মনের আনন্দে পড়েছি। (হাসি)

অদ্রীশ বর্ধন কারোর পড়ে ভালো লাগবে কখনো ভাবিনি। এখনো ভাবি না। দেওয়াল পত্রিকা নিয়ে আমার সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে আমি ছবি আঁকতাম আবার গল্পও লিখতাম। মনিমালায় ছিলাম তো। প্রথম ভূতের গল্প লিখেছিলাম 'পোড়োবাড়ির খাঁড়া'। আমার জীবনের প্রথম গল্প। প্রথম ছাপা গল্প রহস্য পত্রিকায়। কোণের দোকান। সে রহস্য পত্রিকাও নেই সম্পাদক গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নেই। শুধু আমি আছি।

বিশ্বদীপ : রহস্য পত্রিকায় আপনার লেখা পড়ে তো তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আপনার তুলনা করা হত। ততটাই প্রতিশ্রুতিমান একজন লেখক এসেছেন আমাদের কাছে।

অদ্রীশ বর্ধন : শরদিন্দুবাবু আমাকে খুব ভালবাসতেন। উনি আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। ওরকম ভাষা, ওরকম ভাব, ওরকম সংযম এটা যে কোনো গল্পে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। ভূতের গল্পে, বেসিক্যালি 'কালো মোরগ' গল্পে ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন অদ্ভুতভাবে! আর একটা গল্প, ঠিক নামটা মনে পড়ছে না। বোধহয় 'ছবি', গল্পটার নাম। যেটা রোমাঞ্চয় বেরিয়েছিল। গল্পটা উনি অনায়াসেই কল্পবিজ্ঞানে নিয়ে যেতে পারতেন। ফ্যান্টাসির রাজ্য আর কল্পবিজ্ঞানের দোরগোড়ায় গিয়ে উনি গল্পটাকে শেষ করে দিলেন। আমি বলেছিলাম আপনি আর একটু এগোলে তো ওটা অসাধারণ সায়েন্স ফিকশন হত। গল্পটা অসাধারণ। তোমরা হয়ত পড়নি। যাঃ! তোমরা বেড়িয়ে গেল।

সবাই না না। আপনি আমাদের তুমিই বলুন।

অদ্রীশ বর্ধন : গোয়েন্দা গল্পকে অন্ত্যজ সাহিত্য বলা হত। ওটাই ছিল আমার গাত্রদাহ। কৈশোরের ধর্মই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়ে যাওয়া, যেদিকে বাধা সেদিকেই যেতে হবে। আমারও ঠিক তাই ছিল। যেখানে বাধা সেটাকে টপকে টপকে যাব। যে কলমে নীহার গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ লিখতেন না এখন সেই সাহিত্যে সবাই লেখবার জন্য ব্যগ্র। সবাই এখন লিখছে। কল্পবিজ্ঞান তো পরে এল। কল্পবিজ্ঞান। এই প্রতিশব্দটাই তো কারো মস্তিষ্কে ছিল না। ১৯৬৩ সালে আমি 'আশ্চর্য' বার করলাম। সিম্পলি আউট অব ম্যাডনেস।

দেবব্রত : আচ্ছা এটা কি অনেকদিন ধরে ভেবেছিলেন যে পত্রিকাটা করব? হঠাৎ করে কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকা করার কথা মাথায় এল কেন?

অদ্রীশ বর্ধন : ওই যে ম্যাডনেস, বাংলায় এটা নেই। আর কিছু না থাকতে পারে ম্যাডনেসটা আমার ভেতরে আছে। চিরকাল থাকবে। আমি জানতাম সৎ সাহিত্য লেখার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি নিশ্চয়ই প্রেমেন্দ্র মিত্র হতে পারব না। আমি শরৎ চ্যাটার্জীও হতে পারব না। আমার সে ক্ষমতাই নেই। যাঁদের আছে তাঁরা লিখুন। আমি কল্পবিজ্ঞান, ভূতের গল্প, গোয়েন্দা গল্প এগুলো নিয়ে মেতে থাকতে পারি। এগুলো অন্ত্যজ সাহিত্য তো, বাচ্চাকাচ্চারা পড়বে। ওরা আমার ভুল ধরতে পারবে না। (হাসি) অবশ্য তারপরে দেখলাম দেশ ও অন্যান্য জায়গায় আলোচনা বেরোচ্ছে। প্রশংসাও পাচ্ছি।

দেবীকা : আপনি যদি আশ্চর্য পত্রিকাটা না করতেন তাহলে বাংলা সায়েন্স ফিকশন যে কোথায় থাকত! প্ল্যাটফর্মটা তো আপনিই দিয়েছিলেন।

অদ্রীশ বর্ধন একটা ডিভাইন ফোর্স আমাকে দিয়ে করিয়েছে। না হলে করলাম কি করে? আমি চাকরী করতাম। সেই সুবাদে আমাকে ভারতবর্ষ ঘুরতে হয়েছে।

বিশ্বদীপ আপনি চোদ্দবার চাকরি ছেড়েছেন?

অদ্রীশ বর্ধন হ্যাঁ, চোদ্দবার চাকরি ছেড়েছি। আমি ভীষণ অভিমানী। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল, ইমোশনাল। এগুলো না থাকলে ক্রিয়েশন করা যায় না। আমি চাকরীর পরোয়া করতাম না। আমি বিশ্বাস করতাম যে কোন ইন্টারভিউ-তে আমি সফল হব।

দেবব্রত লেখালেখির শুরুর দিকে কোন ঘটনাটি পরবর্তীকালে আপনাকে বার বার অনুপ্রাণিত করেছে?

অদ্রীশ বর্ধন আরবসাগরে বসে বসে 'আমার বান্ধবী সুনন্দা' লিখলাম। জীবনের প্রথম গোয়েন্দা গল্প, প্রসাদ পত্রিকা একটা গোয়েন্দা গল্পের প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছিল। আমি মেরিন ড্রাইভে বসে বসে গল্পের প্লটটা ভাবলাম। আমার বান্ধবী সুনন্দা। লিখে পাঠিয়ে দিলাম।

দেবব্রত কত সালে?

অদ্রীশ বর্ধন ১৯৬০ সাল। নানা, ১৯৫৪ সাল। গল্পটা প্রথম হয়ে গেল। কী আশ্চর্য দেখো একটা গাঁজা গল্প প্রথম হয়ে গেল! (হাসি) তারপর যখন কলকাতায় এসে প্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম উনি ড্রয়ার খুলে আমাকে একগোছা টাকা দিলেন। গুনেও দেখলনে না টাকাগুলো। ওটাই আমার প্রথম পুরস্কার।

দেবীকা 'আশ্চর্য'-এর প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে কিছু বলুন।

অদ্রীশ বর্ধন : অনেক ভেবেচিন্তে 'আশ্চর্য' নামটা মাথা থেকে বেরোল। 'কল্পবিজ্ঞান' প্রতিশব্দটাও বেরোল, সায়েন্স ফিকশন প্রতিশব্দটা কি হবে? কোনও ডিক্সনারীতে নেই। আমিই

ওটা কল্পবিজ্ঞান করলাম। উল্টে দিলাম। ওটাই দাঁড়িয়ে গেল। বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনী নয়। আজকে সব জায়গায় কল্পবিজ্ঞানই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসটা কেউ জানে না। যাইহোক, এত পাগলামি ছিল, ওই যে বললাম ম্যাডনেস এক তলাতে প্রেস বসিয়ে ফেললাম। দুজন কমপোজিটারকে দিয়ে টাইপ কিনে ওখানে কমপোজ হত। ছাপাও হত। মাসে মাসে 'আশ্চর্য' বের হচ্ছিল। 'আশ্চর্য' যে এতটা সমাদৃত হবে ভাবিনি।

দেবব্রত আর সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব?

অদ্রীশ বর্ধন : সায়েন্স ফিকশন কে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে এই উদ্দেশ্যে আমি সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব খুললাম। মানিকদার সঙ্গে বসে ঠিক হল যে সায়েন্স ফিকশনের ক্লাব খুলব।

দেবীকা উনিই তো সভাপতি ছিলেন?

অদ্রীশ বধন : হ্যাঁ। ওনাকে বলেছিলাম যে কল্পবিজ্ঞানকে যদি ছড়িয়ে দিতে হয় তাহলে একটা সিনে ক্লাব দরকার। উনি বললেন, হ্যাঁ খুব ভাল আইডিয়া। আমি বললাম আপনাকে প্রেসিডেন্ট হতে হবে। প্রেমেনদা ভাইস আর তুষারবাবু হবে পেট্রন। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে তুমি হবে সেক্রেটারী। আমি বললাম ঠিক আছে।

বিশ্বদীপ : শুনেছি রেডিওতে মুখে মুখেই আপনারা একটি বারোয়ারী কাহিনী রচনা করেছিলেন...

অদ্রীশ বর্ধন হ্যাঁ। ওটাই রেডিওতে প্রথম কল্পবিজ্ঞান নিয়ে নাটক। 'সবুজ মানুষ'। মাণিকদা, প্রেমেনদা, আমি আর দিলীপ রায় চৌধুরী এই চারজনে মিলে নাটকটা করেছিলাম। মাণিকদা নাটকটা শেষ করেছিলেন। আমরা হেরে গেছিলাম মাণিকদার ভারী গলার কাছে। মাইক্রোফোনে কিভাবে ভয়েস থ্রো করতে হয় উনি খুব ভাল করে জানতেন। ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে আশ্চর্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন একটা চঞ্চল অবস্থার মধ্যে ছিলাম। আসলে, ১৯৭০ সালে আমার বিয়ে হয়। ঠিক ২ বছর পরে আমি বিপত্নীক হই। আমার ছেলের বয়স তখন ১ বছর। ওই এক বছরের শিশুকে মানুষ করব না অন্য কাজ করব! (অন্যমনস্ক) যাইহোক, মাণিকদা আমাকে বললেন তোমার জীবনের প্যাটার্ণ পাল্টে গেছে অদ্রীশ। তুমি 'আশ্চর্য' বন্ধ করে দাও। বন্ধ করে দেওয়ার কিছুদিন বাদে আবার মাণিকদা, প্রেমেনদা ওনারাই বললেন এরকম করে তো চলবে না। তুমি আবার একটা কাগজ বের কর। তখন 'ফ্যানটাসটিক' বেরোল। ১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। মাণিকদা বললেন শুধু পত্রিকা বের করলেই চলবে না। এগুলোকে পাবলিশও করতে হবে। ব্যাস পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রকাশনা। বেরোতে লাগল একের পর এক বই। আজকে কল্পবিজ্ঞান যে জাতে উঠেছে সেটা ফ্যানটাসটিক প্রকাশনার জন্যই।

বিশ্বদীপ : আচ্ছা, কল্পবিজ্ঞান কি বিজ্ঞানের সবটাকে ছুঁতে পেরেছে? নাকি কিছু অধরা থেকে গেছে?

অদ্রীশ বর্ধন : কল্পবিজ্ঞানের বাইরেও একটা জগৎ আছে। সেখানে বিজ্ঞানকে ধরা যায় না। আমরা বলি অতিবিজ্ঞান, যেমন— বিগব্যাং, বিগব্যাং-এর পরিচয় জানার জন্য এখনও প্রচেষ্টা চলছে। আমাকে আনন্দবাজারে রিভিউ করতে বলেছিল। আমি একটাই কথা বলেছিলাম। বিগব্যাঙের আগে কি ছিল সেটা কি কেউ বলতে পারবে? এই মহাবিস্ফোরণটা কেন হল? ব্রহ্মের স্বরূপ কি? কেউ কি বলতে পেরেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ দু'বার সমাধিস্থ হয়ে গেছিলেন। সমাধিস্থ হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি ব্যক্ত করতে পারেন নি। সমাধিস্থ হয়ে সেই অনন্তের রূপ তিনি দর্শন করেছিলেন। কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনন্তকে ধরতে। যেমন — এইচ. পি. লাভক্র্যাফট, পো এর উত্তরসূরী। যিনি মারা গেছিলেন মাত্র ৪৬ বছর বয়সে। উনি ভারতবর্ষের বেদ বেদান্তের পাশাপাশি ইজিপ্ট, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন পুরাণ কাহিনীও নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। ওঁর সমগ্র রচনা কোথাও খুঁজে পাবে না। আমি অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। তবে অনুবাদের সময় যেসব জায়গায় উনি খুব পোয়েটিক ফিলসফিক্যাল হয়ে পড়েছেন সেগুলি আমি বাদ দিয়েছি। কোনও কোনও রচনায় উনি অনন্তের রূপ খুঁজতে গিয়ে জ্যামিতিক ছবির মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু তা আমি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমাকে লিখতে হয়েছে পাঠকের কথা মাথায় রেখে। আমি পো বা কোনান ডয়েলকেও এন্তার এডিট করেছি।

বিশ্বদীপ : আপনার লাভক্র্যাফট অনুবাদ পড়েছি। অসাধারণ। 'এ কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড' পড়ে যা ভয় পেয়েছিলাম! আপনার জুল ভের্ন অনুবাদও দুর্ধর্ষ। এটা সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছা করছে।

অদ্রীশ বর্ধন : জুল ভের্ণ লেখাটাও একটা অলৌকিক ঘটনা। হ্যাঁ, অলৌকিকই বলব। স্ত্রী বিয়োগের পর পর আমি যখন দাদার বাড়িতে ছিলাম, ঠিক রাত আড়াইটেতে ঘুম ভেঙে যেত। তার কারণ ঠিক আড়াইটেতেই আমার স্ত্রী মারা গেছিলেন। এখনও আড়াইটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুমোতে পারি না। ছট্‌ফট্ করি। উঠে লিখতে বসি। তা তখন আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙে গেলে কী করব? এক বছরের ছোট ছেলে ঘুমোচ্ছে। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। আমি তখন বাইরের ঘরে টেবিলে বসে জুল ভের্ণ লিখতে শুরু করলাম। জানো তো, এই জুল ভের্ণ উচ্চারণটাও বাংলায় আমিই প্রথম করি। তার আগে কেউ লিখতেন জুলেস ভার্ণে, কেউ বা জুলে ভার্ণ, কিন্তু সঠিক উচ্চারণ কী হবে সেটা জানার জন্য আমি ফ্রেঞ্চ অ্যামবাসির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওখান থেকেই আমি সঠিক উচ্চারণটা জানলাম— জুল ভের্ণ। জুল ভের্ণ যখন কমপ্লিট হল, মোট ন'টা খণ্ডে বেড়িয়েছিল। বইমেলায় বিক্রি হচ্ছে, তখন ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসির একজন ফ্যানটাসটিক স্টলে এসে বললেন আমি ফুল সেটটা আমাদের প্যারিস লাইব্রেরীতে রেখে দিতে চাই। ওটা কোথায় পাওয়া যাবে? আমি তখন ওনাকে নিয়ে বেঙ্গল এ গেলাম। ওটা আমার একটা স্মরণীয় কীর্তি। এখনও প্যারিসে যদি কখনো যাও দেখতে পাবে লাইব্রেরীতে ওই বইটা আছে। জুল ভের্ণ করতে গিয়ে যেমন আমায় ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসী সাহায্য করেছিল তেমন মাণিকদাও সাহায্য করেছিলেন।

বিশ্বদীপ : বাঃ দারুণ! আমাদের সংখ্যাটার বিষয় যেহেতু

ভয়, তাই ভয় নিয়ে এবার কয়েকটা প্রশ্ন করব। এডগার অ্যালান পো রচনা সংগ্রহের পিছনে জ্যাকেটে লেখা ছিল 'অদৃশ্য দুনিয়ার অলৌকিক বিভীষিকাকে উনি যেন দেখতে পেতেন, অতীন্দ্রিয় আতঙ্ককে উপলব্ধি করতে পারতেন।' আপনিও তো হরর কাহিনী লিখেছেন। আপনার কি নিজে লেখার সময় এরকম কোন Uncanny Feelings হয়েছে?

অদ্রীশ বর্ধন : অফকোর্স। এক কথায় বলব। আমার মনে হয় কে যেন আমার হাত ধরে লিখিয়ে দিচ্ছে। হাতটা যেন কেউ চেপে ধরে আর কলম আপনি চলে যায়। এমন শব্দ তখন মাথার মধ্যে আসে যেটা পরে আসে না। এক কথায় আমি আবিষ্ট হয়ে যাই।

দেবীকা যখন আপনি লেখেন তখনই কি এরকম হয়?

অদ্রীশ বর্ধন হ্যাঁ, তখন খুব ঘন ঘন র চা খাই। এক ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিমেষে খালি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ ইফ আমি যেন অনুঘটক। আমি সূক্ষ্ম আত্মায় বিশ্বাস করি। এটা তো স্থূলদেহ। একটা সূক্ষ্মশরীর ঘিরে রয়েছে। আমি আজও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মেমবার। আমি থিওসফিতে বিশ্বাস করি। আমি এখন পাঁচ হাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা লিখছি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে থিওসফি রয়েছে। লেখা চলছে।

বিশ্বদীপ : স্বপ্নের ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়ল। মাঝে মাঝে এমন হয়, কোন ঘটমান বর্তমানকে হঠাৎ অতীতের পুনরাবৃত্তি মনে হয়। শুনেছি একে "দেঁজাভু" বলে।

অদ্রীশ বর্ধন : সে তো হয়ই। আমি দেখিয়ে দেব স্বপ্ন এমন একটা ব্যাপার, অতীত, সে তো স্মৃতি থেকে আসে। বর্তমানে কোথায় কী ঘটছে তাও দেখা যায়। অনেক সময় কোন প্রিয়জনের আসন্ন মৃত্যুদৃশ্যও স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়। আমি দেখেছি। তোমরা যেহেতু মনের দিক থেকে সবধর্মী বলে মনে হচ্ছে তাই মন খুলে কথা বলছি। এছাড়া বোবা সেজে থাকি। আমি কারোর কাছে এসব কথা বিশেষ বলি না।

বিশ্বদীপ গথিক উপন্যাসের যে ধারা ফার্দিনাদ কাউন্ট ফ্যাদম বা দ্য ক্যাস্‌ল অফ অট্রান্টো থেকে শুরু করে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, ড্রাকুলাতে দেখি সেখানে পোড়ো বাড়ি, দুর্গ, নির্জন প্রান্তর, আলো-আঁধারীর রোমাঞ্চ কাহিনী জুড়ে অবস্থান করছে। গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে গথিক নভেলের ধারা পাল্টাচ্ছে। কেন পাল্টাচ্ছে?

অদ্রীশ বর্ধন : কল্পনার দৈন্য। এক কথায় বলব। এখনকার সাহিত্যিকদের সবাই সাহিত্যিক নন। লেখক। খুব বেশী না দেখলে না পড়লে যা হয়! আমি তো বিশ্বাস করি অনেক পড়লে একটু লেখা যায়। অনেক পড়ার পরে মনে হয় কলমটা যেন একটু সরছে।

দেবব্রত : ভূতের গল্পগুলো পড়লে একটা কথা খুব মনে হয়। এই যে এতসব বিচিত্র ভূতের কথা শোনা যায়, ধরা যাক স্কন্ধকাটা, একানড়ে ইত্যাদি এগুলো আসলে রূপক। এর আড়ালে কোনও অন্য অর্থ আছে। এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?

অদ্রীশ বর্ধন : ভূতের গল্প তো ফ্যান্টাসি। কত রকম ভূত আছে। সবই রূপক। কিন্তু আত্মা আছে।

দেবীকা তারা কি দেখা দিতে পারে? ঘরের ভিতর আত্মাকে কি আমি অনুভব করতে পারব?

অদ্রীশ বর্ধন : সূক্ষ্ম দেহের হলে দেখা দিতে পারে। ছায়ার মত। আমি দেখেছি বহুবার। ছায়া ত্রিমাত্রিক মানে বসে আছে (দীপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এরকম ভাবে দেখা সম্ভব নয়। ছায়ামূর্তির মত দেখতে পাওয়া যাবে। সেরকম মিডিয়ামের চোখ থাকলে তবেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই তত্ত্বটাকে নিয়েই তো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্মদেহের উপর একটা অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

দীপ বাংলায় অনেক ভূত আবার ভয় দেখালে ভয় না পেলে অঙ্ক করে দেয়, ইংরেজী ট্রান্সলেশন করে দেয়। কেমন লাগে ভূতের এই কমিক চিত্রায়ণ? অবনঠাকুর, লীলা মজুমদার বা শীর্ষেন্দুর মিষ্টি ভূতের গল্প কেমন লাগে?

অদ্রীশ বর্ধন : লীলাদি একটু মজা করতে ভালবাসতেন। মজার মজার ভয় দেখাতে ভালবাসতেন। কিন্তু আমি চাই একটু রোমহর্ষক। পড়ে বেশ গায়ের লোম খাড়া হবে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। মাণিকদাও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। উনিও বিশ্বাস করতেন ছোটদের ভয় পাওয়ার প্রয়োজন আছে।

বিশ্বদীপ আপনার মোমের মিউজিয়াম সম্বন্ধে আমি সবাইকে বলেছি যদি সত্যিকারের সাহস থাকে তবেই ওটা পড়তে।

অদ্রীশ বর্ধন আমি খুব ভয় দেখাতে ভালবাসি। আমি নিজে ভয় পেতে ভালবাসি, ভয় দেখাতে ভালবাসি।

বিশ্বদীপ : মোমের মিউজিয়াম তো একটা সায়েন্স ফিকশন। রানটেগথ তো ভীনগ্রহের প্রাণী ছিল। কিন্তু গল্পটা পুরোপুরি একটা হরর গল্প। এই যে সায়েন্স ফিকশন আর হরর গল্পের মিশেল এমন লেখা বাংলায় তেমন পাই না। আবার আপনার আর একটা গল্প আছে, বৈজ্ঞানিক কুমোরটুলি, যেখানে শুরুতে একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হলেও শেষে গল্পটা একটা মজার সায়েন্স ফিকশন হয়ে দাঁড়ায়। এরকম আরও আছে।

অদ্রীশ বর্ধন : ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল। দুটো রসকে মেশানোর চেষ্টা। তবে বৈজ্ঞানিক কুমোরটুলি কিন্তু সত্যি সত্যি সম্ভব। একজন সূক্ষ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তার চিন্তাশক্তি দিয়ে যে কোন মূর্তি গড়তে পারেন। আই বিলিভ ইট। চিন্তার শক্তি। পাওয়ার অফ থট দিয়ে যে কোন কিছু করা যায়।

দেবব্রত আচ্ছা একটা কথা প্রচলিত আছে যে যারা অপঘাতে বা অল্পবয়সে মারা গেছেন তাদের আত্মা খুব বেশী উঁচুতে যেতে পারে না। আবার যারা অনেক বয়সে তৃপ্ত অবস্থায় মারা গেছেন বা যারা খুব যোগী মানুষ তাঁদের আত্মা অনেক উঁচুতে উঠে যায়। প্ল্যানচেট করে সহজে তাদের নীচে নামান যায় না। আপনিও তো প্ল্যানচেট করেছেন। আপনার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে কী বলে?

অদ্রীশ বর্ধন : আহ্বান করার উপর নির্ভর করে। দুষ্ট আত্মারা চট করে চলে আসতে চায়। তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। এটাই মুশকিল। যেমন একবার বাঙালী মহিলার দেহে এক দেহাতী বউ-এর দুষ্ট আত্মা ঢুকে পড়েছিল। তারপর সেই মহিলা

ছাদের কার্নিশ বেয়ে নেচে বেড়াতে লাগল! ওহ, সে এক কাণ্ড।

দীপ : আচ্ছা এবারে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কিছু বলুন। অত বড় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আপনি এসেছিলেন...

অদ্রীশ বর্ধন : এক বর্ষার বিকেলে ওনাকে ফোন করেছিলাম। বলেছিলাম মাণিকদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনার কি সময় হবে? ভীষণ ভারী গলায় উত্তর এল, 'আমার সব সময় সময় আছে। কখন আপনার আসবার সময় হবে?' আমি সময়টা বললাম। গিয়ে দেখি উনি ইজি চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে স্টাডি করতে লাগলেন। আমি ধান্দাবাজ কিনা। (হাসি) ওনার এই স্টাডি ছিল বিখ্যাত। এমনিতে উনি খুব সহজ সরল মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষকে আগে জরিপ করে নিতেন। কেননা এই ফিল্ম লাইন যে খুব নোংরা তা উনি জানতেন। যাইহোক আমি বললাম, 'সোজাসুজি বলছি। আপনার নাম ভাঁড়িয়ে একটা ফিল্ম সোসাইটি করতে চাই। যাতে 'আশ্চর্য' ম্যাগাজিনটা বেশী বিক্রি হয়।' ব্যাস্, এক কথায় বাজিমাত। পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব হল। উনি সভাপতি হলেন।

দেবীকা আচ্ছা আপনি কখনো মেইন স্ট্রীম, মানে...

অদ্রীশ বর্ধন সামাজিক উপন্যাস তো? হ্যাঁ লিখেছি। একবারই। আর দ্বিতীয়বার লিখিনি। লিখবও না। একবারই কেননা মারা যাবার আগে আমার স্ত্রী অভিমান করে বলেছিল সবাইকে নিয়ে লিখেছ, আমায় নিয়ে কিছু লিখবে না? প্রচণ্ড রেগে গেছিলাম। ও যে মারা যাবে আমি কী করে জানব? যাই হোক, ও মারা যাবার পর আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার লোয়ার পোরশান প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল। মেন্টাল শক্ এ। এই অবস্থাতেই লিখেছিলাম 'তখন নিশীথ রাত্রি'। আশ্চর্যের ব্যাপার উপন্যাসটা লেখার পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। বেঙ্গল পাবলিসার্স থেকে ওটা বই হয়ে বেড়িয়েছিল। বইটা যারা পড়েছিল তারা প্রত্যেকেই কেঁদেছিল। বইটা রিপ্রিন্ট এর জন্য অনেক ডিমান্ড আছে। কিন্তু আমি হতে দিই নি। আর দেবও না। যাক্ গে আমি বেশী ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি। আমাকে আর ঘাঁটিও না। বলো অন্য কী জানার আছে?

বিশ্বদীপ সেদিন ইন্টারনেটে একটা ওয়েবসাইটে ভয়ের লেখকদের একটা রেটিং দেখতে পেলাম। সেখানে লাভক্র্যাফটকে রাখা হয়েছে এক নম্বরে আর পো আছেন চার নম্বরে। আপনাকে যদি এরকম রেটিং করতে বলা হয় আপনিও কি তাই করবেন?

অদ্রীশ বর্ধন : কখনোই না। পো চার নম্বর হতেই পারে না। দ্যাখো পো আর লাভক্র্যাফট দুজনেই গ্রেট। আরও অনেকে আছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ওদের মত কেউ না। আমি এঁদের মধ্যে থেকে একজনকে বাছতে পারব না। কখনো মনে হয় পো সেরা, কখনো লাভক্র্যাফট। যাক্ গে, আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি, আমার খিদে পাচ্ছে। (হাসি) তুমি তো একটা বিরাট খাতা নিয়ে এসেছ দেখছি। তুমি বাবা রাত জেগে জেগে লিখে এনেছ আর আমাকেও রাত জেগে জেগে উত্তর দিতে হবে নাকি? (হাসি) আর একদিন কথা হবে। তোমাদের উৎসাহ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। এরকম উৎসাহ দেখলে লিখেও আনন্দ পাওয়া যায়।

দীপ আজ আপনার সাথে কথা বলতে পেরে সত্যিই খুব ভাল লাগছে। আপনার হাত ধরেই তো পো, লাভক্র্যাফটদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

দেবীকা : আমার কাছে তো পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন মনে হচ্ছে। সেই কৈশোর থেকে যাঁর লেখায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছি। আজ তাঁর সাথে সামনা সামনি কথা বলতে পারাটা যে কত বড় প্রাপ্তি বলে বোঝাতে পারব না।

অদ্রীশ বর্ধন : এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী পাব! লক্ষ লক্ষ টাকা বা অসংখ্য পুরস্কারও এই তৃপ্তি দিতে পারে না। এই জন্যই তো লিখি। পাঠকের ভালবাসার চেয়ে আর কী দামী হতে পারে?

অনুক্ত ঈশ্বরীর জন্য

দিবাকর ভট্টাচার্য

তাহলে আপনি এখনো বেঁচে আছেন — মানে এতো কিছুর পরেও — কারণ আপনি টের পাচ্ছেন বাতাসের স্যাঁৎস্যাঁতে স্পর্শ — শুনতে পাচ্ছেন বাইরের বৃষ্টির শব্দ — দেখতে পাচ্ছেন ঘরের গভীর অন্ধকার — হয়তো আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ অন্ধকার যাই হোক বেঁচে যখন আছেন তাহলে তো আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে — যতক্ষণ না রাত আরো বাড়বে — বৃষ্টি আরো জোরালো হবে — অন্ধকার আরো গাঢ় হবে তখন মনে হবে যেন আপনি ছাড়া একটি লোকও নেই এই বিশ্বসংসারে — ঠিক সেই সময়েই আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে এক আধচেনা ব্যক্তি — দাড়িওলা — মাঝবয়েসী — কঙ্কালসার — তার মুখে এসে পড়েছে মোমের হলুদ আলো আপনার মনে হবে এত অন্ধকার চারিদিকে তাহলে আলো আসছে কোত্থেকে — ঠিক তখনই আপনার নজরে পড়বে আপনার সামনের টেবিলের দিকে — যার ওপর কোনোক্রমে জ্বলছে একটা শেষ হতে থাকা মোমবাতি — আপনি অবাক হবেন আরো অবাক হবেন যখন লোকটি প্রায় আপনার ঘাড়ের ওপরে এসে ফিসফিস করে বলবে 'চলুন ডাক্তারবাবু — শিগগির চলুন — ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে।'... হকচকিয়ে গিয়ে লোকটির মুখের দিকে আবার তাকাবেন — কারণ কার সাহস হল এভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলার — যেহেতু আপনি মোহিত ডাক্তার — মানে বিখ্যাত ডাক্তার মোহিত সান্যাল — পেশেন্টের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান।

এইবার দেখতে পাবেন খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা ভাঙাচোরা মুখ, চুলগুলো মুখের উপরে এসে পড়েছে — সারা গা ভিজে সপ্ সপ্ করছে — হাতে একটা আধখোলা ছাতা — আপনি কিছু বলতে যাবেন কিন্তু তার আগেই দেখবেন যে আপনার টেবিল থেকে আপনার ব্যাগটা সে তার হাতে তুলে নিয়েছে। সে আবার বলে উঠবে 'চলুন ডাক্তারবাবু— তাড়াতাড়ি চলুন।'

বলতে বলতে সে এগিয়ে যাবে সামনের অন্ধকারে — আর আপনি ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব কোনো আপত্তি করতেও ভুলে যাবেন — তাই অন্ধের মতো অনুসরণ করতে থাকবেন তাকে — সে উঠে বসবে বাইরে দাঁড় করানো রিক্সাটায় — আপনাকেও টেনে তুলবে সেখানে — বসাবে তার পাশটাতে — তারপরই রিক্সা চলতে শুরু করবে সেই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আপনার গলা শুকিয়ে আসবে — ঠোঁট কাঁপতে থাকবে — জিভ জড়িয়ে যাবে আতঙ্কে, তবুও জোর করে অনেক চেষ্টা করে বলতে পারবেন — 'কী হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেবে — 'আমার বাড়িতে'। আপনি এবার আরেকটু সাহস করে — গলা ঝেড়ে জিজ্ঞাসা করবেন — 'কী হয়েছে? কে পেশেন্ট?'

লোকটি আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে কী উত্তর দেবে তা শোনা যাবে না কারণ তার কথা ঢেকে যাবে কাছেই বাজ পড়ার আওয়াজে — আপনি শুধু বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পাবেন তার দৃষ্টিটা — যেভাবে কাউকে কখনো দেখেননি আপনার দিকে তাকাতে। আপনি কি মনে করে মুখ নীচু করে নেবেন আর ভাবতে থাকবেন কী ভয়ঙ্কর বিপদে পড়া গেলে এই বচ্ছরকার দিনে — আপনার ভাবনাচিন্তা গুলিয়ে যাবে যখন টের পাবেন একটা বিরাট ঝাঁকুনি — যে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে থেমে যাবে রিক্সাটা — তক্ষুনি খেয়াল হবে একটু আগেই পাশের লোকাটি বলেছিল 'বাঁয়ে ঘুরে রাখো — বাঁয়ে ঘুরে'। এইবার আপনি দেখতে পাবেন এসে হাজির হয়েছেন কোন এক গলি ঘুঁজির ভেতর — চারিদিকে জল থৈ থৈ — আর চাপ চাপ অন্ধকার সেই সঙ্গে ঘন বৃষ্টির ফোঁটা

লোকটি বলবে আসুন আমার হাত ধরে নেমে পড়ুন। আপনি কোনোক্রমে এটা সেটা ধরে নেমে পড়বেন রিক্সা থেকে — তারপর ওই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কীভাবে কোথায় যে ঢুকে পড়বেন তার কিছুই বুঝবেন না — মনে হবে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে — ভাঙ্গাচোরা বারান্দার রেলিং ধরে ধরে অন্ধকার কয়েকটা ঘর পার হয়ে হাজির হলেন কোন পোড়ো বাড়ির অন্দরমহলে একটা মাঝারি মাপের বসার ঘরে — ঢুকে দেখবেন একটা কালিঝুলি মাখা কম পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে সিলিং থেকে — সেই বালবের উপর ফুলকাটা কাঁচের শেড — সেই শেডের ছায়া পড়ছে নোনাধরা দেওয়ালের গায়ে — অল্প অল্প বাতাসে সেই ছায়া অদ্ভুতভাবে দুলছে চার দেওয়ালের কোণে কোণে — আর ঠিক তখনই আপনার মনে হবে এই ঢেউ খেলানো ছায়াগুলো আপনার কী ভীষণ চেনা।

এইবার আপনার নজর পড়বে দেওয়ালের কোণের ছবিগুলোর দিকে চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো হলুদ হয়ে যাওয়া কটা ছবি — এরই পাশে হলুদ কাগজে একজোড়া আলতা রাঙানো পায়ের ছাপ শুনতে পাবেন কিটকিট করে ঘুণপোকার আওয়াজ — দেওয়ালের কাছে গিয়ে দেখতে যাবেন সেই আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে — আর তখনই আপনি টের পাবেন আপনার সাথের লোকটি আপনার ধারে কাছেও নেই — কারণ আপনি ঘরে ঢুকে এতটা আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন যে বুঝতেও পারেননি সেই লোকটি কোন ফাঁকে পালিয়েছে কোথায় — অর্থাৎ আপনি এ ঘরে এ অবস্থায় এখন সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু তা নয় — কারণ আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে একটি অল্পবয়সী মেয়ে — খুব আস্তে করে বলবে 'আসুন ডাক্তারবাবু এদিকে আসুন' — আপনি তার পিছু নিয়ে এসে হাজির হবেন একটা আরো ছোটোগুমোট ঘরে — সে আপনাকে একটা লোহার চেয়ার টেনে বসতে বলবে — আপনি লক্ষ্য করবেন এ ঘরটা আরো অন্ধকার আর ভ্যাপসা — এদিকে আপনাকে বসিয়েই মেয়েটি ভিতরে কোথায় চলে যাবে কে জানে — এদিক ওদিক তাকাতে থাকবেন — তখনই নজরে পড়বে ঘরের কোণায় রাখা নোংরা বিছানাটার উপর

যার উপর তালগোল পাকানো বালিশ চাদর, সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ আছে মনে হয় — এইবার আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে এইভাবে ডেকে আনা হল কেন — কারণ আপনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তার — ডাক্তার মোহিত সান্যাল।

কী আর করা তাই আপনি এগিয়ে যাবেন বিছানাটার পাশে — চাদরটা টেনে মুখটা দেখার চেষ্টা করবেন। অবশ্য এই ধরনের মুখ আপনি আগেও ঢের দেখেছেন। হাঁ করা চোখ বের করা কঙ্কালসার মুখ। এরপর চোখে টর্চের আলো ফেলে, গায়ে হাত দিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন কতক্ষণ আগে চলে গেছেন এই হতভাগ্যটি।

সহজেই বুঝতে পারবেন ইনি মারা গেছেন অনেকক্ষণ আগেই। মনে হবে এঁর তিনকুলে নিশ্চয়ই কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখবেন কেউ আসছে কিনা— কিন্তু কারো সাড়া পাবেন না। বাধ্য হয়ে চেঁচিয়ে বলবেন কী হল? কেউ নেই নাকি?'

কিন্তু আপনার ডাকের কোন উত্তর আসবে না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লোহার চেয়ারটা টেনে নিয়ে আবার বসে পড়বেন — মেঝের চেয়ারটা ঘসড়ানো বিশ্রী আওয়াজে শরীরটা শিরশির করে উঠবে — সেই সময়ই দেখতে পাবেন নিঃশব্দে ঘরের দরজায় এসে মাথা নীচু করে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অল্পবয়েসী মেয়েটি — আধো অন্ধকারে তার মুখটা ঠিক ঠাহর করা যাবে না।

এইবার কঠিন গলায় আপনি বলবেন — 'এভাবে ডেথ সার্টিফিকেট তো আমি দিই না কখনো' — কিন্তু এ কথার কোনো উত্তর আসবে না — অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে বলবেন — 'কে হয় তোমার? কখন হল?' মেয়েটি মাথা নীচু করেই উত্তর দেবে 'মনিপিসি। বিকেল চারটে নাগাদ চলে গেলেন।' আপনি জিজ্ঞাসা করবেন 'কী হয়েছিল? কী চিকিৎসা চলছিল। মেয়েটি কোন উত্তর করবে না। আবার জিজ্ঞাসা করবেন 'চিকিৎসার কোনো কাগজপত্র আছে?' মেয়েটি মাথা নেড়ে না বলবে। তখন অনেক কষ্টে রাগ চেপে বলবেন 'কোনো ওষুধপত্র খেতেন?' মেয়েটি মাথা নীচু করেই উত্তর দেবে 'ওই হাঁফানির জন্য — যখন বাড়তো — চিনুদার দোকান থেকে ...' এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আপনি প্রায় নিস্তার পাওয়ার জন্যেই বলে বসবেন 'যাকগে আমি লিখে দিচ্ছি — বাড়ির আর কাউকে ডাকো বডিটা এক্সপোস করতে হবে।' মেয়েটি বলবে 'কেউ নেই'। আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন — অনেক কষ্টে ধৈর্য রেখে বলবেন 'এদিকে এসো চাদরটা সরাও।'

চাদরটা সরাতে যেতেই উল্টে যাবে সেই কঙ্কালসার দেহটা। কুঁকড়ে থাকা শরীরটায় কোনো কাপড় চোপড় নেই বললেই চলে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখে পড়বে তার পিঠের মাঝখানে একটা প্রজাপতির মতো বিরাট জুড়ুল। এবং এটাও আপনার ভীষণ চেনা। কিন্তু সে ভাবনায় মন না দিয়ে তাড়াতাড়ি বডিটাকে সোজা করে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেবেন আপনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলবেন 'আমার দ্বারা হবে না। কেস অব ডেথ বোঝা যাচ্ছে না। তুমি বরং অন্য কাউকে

আপনার কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি বলে উঠবে 'ডাক্তারবাবু প্লিজ আপনি '

আপনি অভিজ্ঞ ডাক্তার — এইসব কথা ঢের শুনেছেন — তাই কোনো কথা না বলে ব্যাগ হাতে বেরোতে যাবেন ঘর থেকে। ঠিক তখনই টের পাবেন একটা উষ্ণ হাতের স্পর্শ আপনার হাতের উপর। 'মাপ করবেন ডাক্তারবাবু—'

বিস্মিত হয়ে ভাববেন স্পর্ধা কম নয় তো মেয়েটার, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছে — কঠোর চোখে তাকাতে যাবেন কিন্তু গভীর অন্ধকারে হঠাৎ ঢেকে যাবে চারিদিক মেয়েটির কথা কানে আসবে — 'ঠিক এই সময়টায় কারেন্ট চলে যাচ্ছে আজকাল।'

এরপর আবার নিঃস্তব্ধ হয়ে যাবে চারিদিক — বুঝবেন এই সুযোগ। ব্যাগটা নিয়ে টর্চের ছোট্ট আলোয় এগিয়ে যাবেন সামনে দরজার দিকে — আর যেতে গিয়েই ঠং করে একটা আওয়াজে বুঝবেন আপনারই পায়ে লেগে উল্টে গেল মেঝেয় রাখা কোনো কাঁচের গ্লাস। চমকে উঠবেন আপনি এই সামান্য আওয়াজেই — আর তাতে করে হাত থেকে ফসকে পড়ে নিভে গেল সবেধন নীলমণি ছোট্ট টর্চটা।

কিন্তু তাতেও থামবেন না আপনি। হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন — যতক্ষণ না সপাট একটা ধাক্কা খাবেন। সাথে সাথেই বুঝবেন সেটা দরজা নয় একটা আধখোলা জানালার পাল্লা।

আর বুঝবেন এই জোরালো ঠোক্করে পড়ে গেল চশমা। বোধহয় কেটে গেল কপালের পাশটা। মনে হবে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ বোধ হয় ঘাড়ের উপর এসে পড়বে এক্ষুনি। আর ঠিক তখনই শুনতে পাবেন পিছন থেকে আসা এক নরম কণ্ঠস্বর — 'ডাক্তারবাবু এদিকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখবেন মোমবাতি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি। এইবার তার মুখটি দেখতে পাবেন আপনি — সেই মোমবাতির নরম হলুদ আলোয়। স্তম্ভিত হবেন আপনি কারণ দেখবেন এ মুখশ্রীতে ছিল আপনারই একান্ত অধিকার।

এরপরেই আপনার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা অদ্ভুত শীতল স্রোত বইতে শুরু করবে — এই বাড়ি — এই ঘর — এই অন্ধকার বৃষ্টির রাত — আর সামনে পড়ে থাকা ওই কঙ্কালসার মৃতদেহ যার পাশেই দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি — হাতে সেই মোমের আলো — যার হলুদ আভায় ধুইয়ে দিচ্ছে তার সেই অনুপম মুখের ঐশ্বর্য — তা কী করে সম্ভব?

একই ঘটনা কি হুবহু একইভাবে একজনের জীবনে ত্রিশ বছর বাদে ফিরে আসতে পারে? অথচ সবকিছু মিলে যাচ্ছে অবিকলভাবে— তাহলে — তাহলে কি যা ঘটছে সবকিছুই অলীক? কাল্পনিক? অবাস্তব?

কিন্তু আপনার চোখের সামনে এত স্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে সেকি কখনো মিথ্যা হতে পারে?

তাই আপনার হাত বাড়াবেন — আপনার নিজের হাতে স্পর্শ করবেন সেই মুখটিকে — মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকবে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে — আর সেই মুখ চোখ গলা

বেয়ে নেমে আসতে থাকবে আপনার হাত — ঠিক ত্রিশ বছর আগের মতো — আপনার হাতের উপর নিজের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না — ঠিক যেমন ঘটেছিল ত্রিশ বছর আগে — হয়তো আপনার বিনা চেষ্টাতেই কীভাবে যেন খসে পড়বে তার শাড়ির আঁচল — আপনি দেখতে পাবেন তার সুবর্ণ সম্পদদুটির আভাস — আপনি স্পর্শ করবেন তাদের অনুভব করবেন এক অতীত উষ্ণতা — আপনার মনে হবে এ মিথ্যে নয় — কল্পনা নয় — ঘোর বাস্তব —,আর তখনই দমকা হাওয়ায় নিভে যাবে সেই মোমের আলো — চারিদিক আবার ঢেকে যাবে অন্ধকারে — মেয়েটি কোনো চেষ্টাই করবে না আবার জ্বালতে — তাই ঘোর অন্ধকারে — হয়ত আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ অন্ধকারে ঢেকে থাকবে চারিদিক।

আর ঠিক এতটা অন্ধকারের জন্যই অপেক্ষা করে থাকতে হবে আপনাকে কেননা আপনি বেঁচে আছেন এক কিছুর পরেও...

(২)

কিন্তু আমরা জানতাম মানে ভেবেছিলাম আপনি আর নেই — কারণ তখন আপনার শ্বাস পড়ছিল না — চোখের পাতা স্থির হয়ে গিয়েছিল — গা হাত পা ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা — পড়েছিলেন নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় — প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তায় মরা কুকুরের মতো — অথচ বাড়ির দরজা খোলাই ছিল — তাহলে কি চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন আপনি? যাচ্ছিলেন কোনো গোপন ডেরায়? কিংবা আরো গোপন কারো কাছে?...

যাই হোক আমরা ভেবেছিলাম আপনি মারা গেছেন — কারণ আমরা জেনেছিলাম সে রাত্রে আপনি

থাক সে কথা — আমাদের সবকিছু জানার মতো এ জানাও ছিল সম্পূর্ণ একটি কাহিনি।

যেমন কিনা আমরা জানতাম বছর ত্রিশেক আগের কয়েকটি ঘটনা

আমরা সেই ত্রিশ বছর আগের সেই বিকেলগুলোর কথা জানতাম। যখন হাতে মোটা মোটা বই নিয়ে সেই ছেলেটি হেঁটে যেতো মিত্রবাড়ির পাশ দিয়ে — সময়ে অসময়ে — দরকারে অদরকারে — আর মিত্রবাড়ির দোতলার সবুজ কাঠ ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো একটি অল্পবয়সী মেয়ে — যতক্ষণ না সেই ছেলেটির ছায়া সরে যায় সামনের রাস্তা থেকে — ছেলেটিও প্রতিবার গলি দিয়ে বাঁকবার সময় অকারণে মুখ তুলে তাকিয়ে নিতো মিত্রবাড়ির বারান্দার দিকে — যতক্ষণ না দেখতো পেতো সেই গৌরী মুখশ্রী। এইভাবেই শুরু হয়েছিল তাদের চাক্ষুষ সম্পর্ক।

কিন্তু ঈশ্বর বোধহয় তাদের দু'জনের উপরই খুব দয়াশীল ছিলেন। তাই সম্পর্ক নিকট হয়ে গেল সহজেই।

মেয়েটি থাকতো তার মামার বাড়িতে। নিজের মা বাবার থেকে অনেক দূরে। কারণ এই মামা ছিলেন নিঃসন্তান। মেয়েটির আরো তিনটি ভাইবোন ছিল। সে ছিল সবার ছোট। তাই বড় আদরের। মামী তাকে মায়ের মতোই ভালবাসতেন।

ছেলেটি মেডিক্যাল কলেজে পড়তো। থাকতো তার এক বন্ধুর বাড়ি। কারণ তার নিজের বাড়ি মফঃস্বলে। বন্ধুর বাড়িটি ছিল মিত্রবাড়ি থেকে মিনিট খানেকের হাঁটা পথের দূরত্বে।

কোনো একটি পূজাপার্বন উপলক্ষ্যেই ছেলেটির বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়েছিল মিত্রবাড়িতে। সেই সময় ছেলেটিও গিয়েছিল তার সাথে। তার বন্ধুই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তখনই পরিচয় পাওয়া গেল তার। জানা গেল ছেলেটির মা মেয়েটির মামীর ছোটোবেলার বন্ধু।

ফলে মায়ের সুবাদেই যাতায়াত বাড়লো তার মিত্রবাড়িতে। আলাপ হল বন্ধুত্ব হলো বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে অর্থাৎ মেয়েটির মামা ও তার কয়েকজন আত্মীয় জ্ঞাতির সঙ্গে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কোনো কথাই বলার সুযোগ হোল না তার। কেবল আরো কাছ থেকে দেখতে পাওয়া ছাড়া। কিন্তু সেটাই সেই ছেলেটির কাছে ছিল অমূল্য।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি বছর কেটে গেল। মেয়েটি স্থানীয় কলেজে ভর্তি হলো। ছেলেটি ডাক্তারি পাশ করলো।

সেদিন মিত্রবাড়িতে এসে দেখল মেয়েটির মামীমা অর্থাৎ তার মায়ের ছোটবেলার সেই বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট, বুকে কফ ইত্যাদি। ছেলেটি তখন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। সকলেই একটু সমীহ করে। সে বললো 'আমি একটা দিন ওষুধ দিয়ে দেখি। তেমন কাজ না হলে আমার হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো।' মেয়েটির মামা অর্থাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন — তুমি যা ভালো বোঝো করো। ছেলেটি বললো — 'ঠিক আছে কাল রাতে এসে দেখি কেমন থাকেন।'

পরদিন বেশ ভালো ছিলেন তিনি। তাই বাড়ির সকলেই গিয়েছিল একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। বাড়িতে ছিল সেই মেয়েটি। আর তার অসুস্থ মামীমা। সারা দিন তাঁর কোনো অসুবিধে ছিল না। বিকেলের আগেই ফিরে আসার কথা ছিল সকলের। সন্ধ্যায় আসার কথা ছিল সেই ডাক্তার ছেলেটির।

কিন্তু দুপুর থেকেই যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আর সে বৃষ্টি থামতেই চায় না। সন্ধ্যা হতেই মেয়েটির মামীমার প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। মেয়েটি চোখের সামনে দেখতে থাকলো তার মামীমার অবস্থার অবনতি। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। কারণ সেই ভয়ানক বৃষ্টিতে কারোরই কিছু করা সম্ভব ছিল না। এইসব ভাবতে ভাবতেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোলো। এই কড়া নাড়ার শব্দ মেয়েটির ভীষণ পরিচিত। মেয়েটি দেখে অবাক হোলো সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারী ব্যাগ হাতে এসে হাজির হয়েছে ছেলেটি। মেয়েটি যেন ভগবানকে হাতে পেল।

ছেলেটি ঘরে গিয়ে দেখল ভদ্রমহিলার অবস্থাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক। সে তার ব্যাগ বার করে একটার পর একটা ইঞ্জেকশন দিতে লাগলো। কিন্তু কোনো ফল দেখা গেল না। তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলো।

আর ঠিক সেই সময়েই সমস্ত আলো নিভে গেল কোনো যান্ত্রিক গোলযোগে। ছেলেটি দেখল মেয়েটি কোত্থেকে একটা ভাঙ্গা মোমবাতি জ্বালিয়ে এনেছে হাতে করে — তার সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপ্ করছে — শরীরের সমস্ত সম্পদ ভিজে কাপড়ের আড়ালে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে।

ছেলেটি স্তম্ভিত হল তাকে দেখে — ভাবলো এক সত্যি রক্তমাংসের মেয়ে না পাথরকে খোদাই করা কোনো মূর্তি —

তার হাত অজান্তেই চলে গেল সেই মূর্তি বা মেয়েটির দিকে —• স্পর্শ করলো তার স্বর্ণগোলক দুটিকে — আর সাথে সাথেই কোনো এক দমকা হাওয়ায় নিভে গেল মেয়েটির হাতের মোমবাতিটা।

সেই অন্ধকারে তারা ঠিক কী কী করেছিল তা আমরা জানি না — কিন্তু সেই মুমূর্ষু মহিলা কখন যে স্থির হয়ে গেলেন সেই ঘরের কোণের অন্ধকারে তা আমাদের জানা ছিল।

অবশ্য আবার বলছি আমাদের সবকিছু জানার মতো এ জানাও ছিল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

(৩)

কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা নিশ্চিতভাবে জানি তা হল আপনি বেঁচে আছেন। কিন্তু আপনার তো বাঁচার কথা ছিল না। ভেবেছিলেন আপনার সব পাপ এবারে বেরিয়ে পড়বে গলগল করে পচা রক্তের মতো ওই ত্রিশ বছরের পুরোনো ঘটনার সূত্র ধরে।

সেইদিন যখন আপনার চেম্বারে সেই হতদরিদ্র মুমূর্ষু মানুষটাকে নিয়ে এসেছিল খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা সেই লোকটা — আপনার দিকে তার ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে অস্ফুটে বলেছিল 'মোহিত—মোহিত'। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি তার শরীরটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে আপনি মুখোমুখি আর না হন — তার পিঠের দিকটা আপনার সামনের দিকে থাকে — আর সেটা করতে গিয়েই অর্থাৎ পিঠের দিক থেকে স্টেথো দিয়ে শুনতে গিয়েই দেখতে পেয়েছিলেন সেই প্রজাপতির মতো জুড়ুলটা যা আপনি কোনোদিনও ভুলতে পারবেন না — আপনি শিউরে উঠেছিলেন। আপনি চাননি সে সুস্থ হয়ে উঠুক — কারণ সবাই তো মরে হেজে গেছে — কেবল আসল সাক্ষী ছাড়া — যে আপনার পাপের একটা গলাপচা জ্যান্ত ছবি হয়ে এতদিন বাদে সামনে এসে দাঁড়ালো।

আপনি তার কী চিকিৎসা করলেন? তার উত্তর আপনি নিজেই জানেন। ভেবেছিলেন এই বার সব পাপ উড়ে পুড়ে ফাঁকা হয়ে যাবে — আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন — মুক্তির আনন্দ পাবেন — কিন্তু মণিমালারা চেম্বার ছেড়ে চলে যাবার খানিক পরেই কি হয়েছিল আপনার? — অত ছটফট করছিলেন কেন? — কেন চাইছিলেন সেই খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে দেখা করতে? কেন আবার সন্ধেবেলায় চেম্বার ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন সেই দাড়িওয়ালার ডেরায়? কার সাথে কথা ছিল আপনার? মণিমালার সাথে? না তার অবৈধ কন্যাটির সাথে? কোন পাপবোধ, নাকি ভয়, নাকি আতঙ্ক আপনাকে ছুটিয়েছিল ওই সন্ধ্যায়?

এসব উত্তর আমরা জানি না। আমরা কেবল জেনেছিলাম লোকটি আপনাকে নির্বিকারভাবে উত্তর দিয়েছিল — 'মণিমালা তো মারা গেছে আজ দুপুরেই — আপনার চেম্বার থেকে ফিরে আসার সময়েই শ্বাস উঠেছিল — বোধহয় এই প্রচণ্ড গরমে—' লোকটির কথাগুলোয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন আপনি — তাও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকটি নির্বিকারভাবে বলেছিল— না ডাক্তারবাবু থাক। আপনার মতো মানী লোক সন্ধেবেলায় ওই বেশ্যাবাড়িতে যাবেন — ওর মেয়েটিকে তো চেনেন না — নিজের মা-কে পিসি বলে ডাকে কারা জানেন?' আপনি আঁতকে উঠেছিলেন সেকথা শুনে। তারপরেও শুনেছিলেন মণিমালা ও তার ওই মেয়ের জীবনযাপনের কিছু টুকরো কথা। আপনার মাথা দপ্ দপ্ করতে লাগলো — বুকের মধ্যে হাতুড়ি মারতে থাকলো।

তারপর যেন মনে হল আপনি হঠাৎ ভারমুক্ত হয়ে গেলেন — শ্বাস নিলেন বুক ভরে — এতক্ষণ দম আটকে ছিল।

আপনি নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন — অনেক হাল্কা হয়ে — অনেকদিন বাদে মনে হল আপনি মুক্ত — গ্লানিমুক্ত — কিন্তু এখনো জীবনের কিছুটা বাকি আছে — সারাটা জীবন নষ্ট করেছেন ভোগ না করে — সংসার না করে এক অদ্ভুত পাপবোধে ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গিয়ে — তাকে গলা টিপে হত্যা করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি — দূর করে দিতে চেষ্টা করেছেন মন থেকে — হেরে গেছেন বারবার — আজ তা নিজে থেকেই উড়ে পুড়ে ফাঁকা হয়ে গেল।

বাঁচা গেল। অর্থাৎ যে কটা দিন বাঁচা যায়। অতএব ভোগ করবেন দুহাতে অবশিষ্ট জীবন।

তাই চেম্বারে একা বসে বসে পানের মাত্রাটা বাড়তে লাগলো। মাথায় আবার আগুন লক্‌লক্ করতে লাগলো — তাই আবার মনে হল ওখানেই যাবেন ওই বাড়িতে আজই রাতে — শুষে নেবেন সেই মেয়েটির সবকিছু কারণ তার মা — তার মা ঠকিয়েছে আপনার জীবনের সমস্ত ত্যাগকে — অতএব তারই জরায়ুজাকে সুদে আসলে বুঝে নেবেন তিনি

পারলেন না — আপনি পারলেন না — মুখ থুবড়ে পড়লেন নিজের বাড়িরই সামনে — এক গাঢ় অন্ধকার ঢেকে দিল আপনার সমস্ত চেতনা

পানের পরিমাণটা যথেষ্ট বেশি হয়েছিল এ সময়ে — সেটাই হয়তো সহ্য হয়নি — বিশেষতঃ এতদিনের অনভ্যাসের পর অন্ধকার জড়িয়ে এসেছিল চোখে — কতো রঙিন রঙিন অন্ধকার

আপনি এখনো বেঁচে আছেন — টের পাচ্ছেন বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শ — টের পাচ্ছেন বাতাসের কনকনানি তাই — তাই আপনি অপেক্ষা করুন আরো গভীর বৃষ্টির জন্য — আরো ঘন অন্ধকারের জন্য

হয়তো আবার আসবে সেই খোঁচা মুখ দাড়িওয়ালা

আবার সেই হলুদ মোমের আলো

যে আলো সবশেষে ভেসে যাবে অন্ধকার আকাশগঙ্গায় — আপনার অনুক্ত ঈশ্বরীর জন্য

(পুনর্মুদ্রিত)

কিল্ডারি জলার চাঁদ (The Moon Bog)
by H. P. Lovecraft (অনুবাদ — দীপ ঘোষ)

ডেনিস ব্যারি আজ কোথায় আমি জানি না। কাল রাত পর্যন্তও সে আমাদের মাঝেই ছিল, আমি ওর আর্তনাদও শুনেছিলাম যখন সেই অশরীরী আতঙ্ক ওকে নিয়ে গেল। আজ কিল্ডারির সমস্ত পুলিশও আর ব্যারিকে খুজে পাবে না। আর আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, পূর্ণিমার চাঁদ আমায় সেই ভয়ঙ্কর জলাটার কথা মনে করিয়ে দেবে।

ব্যারির সাথে আমার আলাপ আমেরিকায়। যুদ্ধের সময় ব্যবসা গুটিয়ে কিল্ডারির পৈত্রিক সম্পত্তিতে ফিরে যাচ্ছে, আমি ওর এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আয়ারল্যান্ড এর কিল্ডারির ওই পুরনো কেল্লা থেকে ব্যারির পূর্বপুরুষ বহুদিন এই উপত্যকায় জমিদারি করেছিলেন, ব্যারির বাবা আমেরিকায় সপরিবারে চলে যাবার পরে কেল্লাটি আস্তে আস্তে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছিল। ব্যারি আবার ফিরে আসায় উপত্যকার সমস্ত মানুষ তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল। ব্যারি তাদের নতুন শিল্প আর উন্নতির স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু যখন হঠাৎ সবাই রহস্যময়ভাবে কিল্ডারির উপত্যকা ছেড়ে পালাতে লাগল তখন নিরুপায় ব্যারি আমায় চিঠি লিখল। নিঃসঙ্গ ব্যারির কথা ভেবে ওর এই আমন্ত্রণ আমি ফেরাতে পারলাম না।

আমি কিল্ডারিতে পৌঁছলাম এক গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে। সোনালি রোদ ছুঁয়ে যাচ্ছিল দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ জঙ্গল আর তার মাঝে বিরাট জলাটাকে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল এই জলা আর তার মাঝের পুরনো ধ্বংসস্তুপই ব্যারির সব অসুবিধার কারণ। তারপরেই মনে পড়ল ব্যলিলগ স্টেশন এর লোকেরা আমায় এই জলাটার ব্যাপারে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গল্পগুলো বলার চেষ্টা করছিল। অনেক গ্রামবাসী আমায় এমনকি কিল্ডারি যেতে বারণও করেছিল। ওদের ফ্যাকাসে মুখগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল যখন ব্যারির গাড়িটা কিল্ডারির পুরনো কেল্লায় ঢুকলো। রাতে খাবার সময় ব্যারি সব খুলে বলল, কেন কিল্ডারির বাসিন্দারা উপত্যকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সমস্ত গণ্ডগোলের সূত্রপাত যখন ব্যারি ঠিক করে, জলা বুজিয়ে নতুন কৃষিজমি উদ্ধার করতে হবে। জলাটাকে ঘিরে কিল্ডারির পুরনো কুসংস্কার আর গল্পকে ব্যারির আমেরিকা ফেরত বিজ্ঞানভিত্তিক মন কোনো পাত্তা দেয়নি। এমনকি যখন গ্রামবাসীরা ওকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে আর কিল্ডারি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে, তখনও ওর পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। ব্যারি খুব সহজেই আমেরিকা থেকে বেশ কিছু বিদেশী মজুর এনে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করে।

প্রথমবার আমি যখন গ্রামবাসীদের ভয়ের কারণ শুনলাম, আমিও ব্যারির সাথে গলা মিলিয়ে হেসে উঠেছিলাম। জলার পুরনো ধ্বংসস্তুপটাকে ঘিরেই যত অবাস্তব কুসংস্কার আর গ্রাম্য গল্প। কোন প্রাচীন উপদেবতা নাকি জলাটিকে রক্ষা করে আসছে যুগ যুগান্ত ধরে। গ্রামের মানুষ নাকি বহুবার জলার বিষাক্ত কুয়াশার মধ্যে অশরীরী ছায়ামূর্তি আর আলোর ফুলকি উড়ে যেতে দেখেছে। তবে সবথেকে হাস্যকর গল্পটা হল, কেউ যদি জলাটিকে স্পর্শ করে বা নষ্ট করতে চায় তবে তার জন্যে এক অভিশপ্ত শাস্তি অপেক্ষা করছে। পুরনো বই ঘেঁটে ব্যারি দেখেছে জলাটার বয়স কিল্ডারির থেকেও অনেক বেশি। গ্রীকরা যখন এই এলাকা দখল করে একের পর এক শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করছে তখন এক আদিবাসী চন্দ্র পূজারী জাতির পুরো শহরটাকে নাকি তাদের দেবী এই জলার নিচে আশ্রয় দেন। এখনও চাঁদনী রাতে জলার ধ্বংসস্তুপে সেই শহর নাকি জেগে ওঠে।

অবশ্যই এই গ্রাম্য গল্প ব্যারির শিক্ষিত মনে কোনো রেখাপাত করেনি। তবে ব্যারির আগ্রহ ছিল জলার সব জল বার করে দেবার পর খুঁজে দেখা, জলের তলায় সত্যিই কোনো ধ্বংসস্তুপ আছে কিনা। বিদেশী শ্রমিকরা খুব উৎসাহের সাথেই কাজ শুরু করেছিল, আমার মনে হচ্ছিল খুব তাড়াতাড়িই ওই সবুজ ওলাঘন জল আর লাল পাতায় স্তুপ পেরিয়ে কোন গোপন রহস্যের সন্ধান আমরা পাব।

সারাদিনের ক্লান্তিকর যাত্রার পর আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। খাওয়ার পর ব্যারির এক পরিচারক আমায় শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি দুর্গের এক প্রান্তে, জানলা দিয়ে দেখা যায় সামনে একটা ছোট গ্রাম আর তার পরে শুরু হয়েছে জলার সীমানা। চাঁদের আলোয় জলার ভিতরের ধ্বংসস্তুপের সীমানাটুকু শুধু অপার্থিব কোনো স্বপ্নরাজ্যের মত লাগছিল। আমি জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ঘুমের মধ্যে আমি যেন অনেক দূর থেকে আসা কোনো অপার্থিব অজানা ভাষার গান শুনতে পাচ্ছিলাম। জানিনা ওই অদ্ভুত সুরের জন্যেই কিনা, আমি স্বপ্ন দেখলাম এক অদ্ভুত প্রাচীন শহরের। সবুজ সুন্দর উপত্যকার মাঝে এক শান্ত শহর, যার সমস্ত রাস্তা মার্বেলের, সুন্দর বাড়ি, মন্দির আর অপূর্ব স্থাপত্য, কোনো এক ফেলে আসা সময়ের সাক্ষর বহন করছে। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃরাশের টেবিলে আমি ব্যারিকে স্বপ্নটার কথা বললাম। আমরা দুজনেই খুব হাসলাম, এই ভেবে যে, আমার ক্লান্ত মস্তিষ্কে গ্রাম্য কুসংস্কারের গ্রাসে এমন আশ্চর্য স্বপ্ন দেখাতে পারে। ব্যারিকে একটু চিন্তিত

দেখাচ্ছিল, ওর নতুন শ্রমিকরা নাকি ক'দিন হল অনেক বেশি সময় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল। অথচ কাজের সময় তাদের সত্যিই খুবি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

সারাদিন আমি একাই গ্রামের মাঝে ঘুরে বেড়ালাম। ব্যারি ওর জমিদারির হিসেব আর জলা শুকোনোর পরিকল্পনা শেষ করার জন্যে বাড়িতে থেকে গেল। আমি গ্রামের লোকেদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। বেশির ভাগই বলল তারা রাতে কোন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার জন্যে অস্বস্তিতে ভুগছে। আমি যখন তাদের সেই অদ্ভুত সুরের কথা বললাম, অনেকেই মনে করতে পারল যে তারাও সেই শব্দ শুনেছে।

রাতে খাবার টেবিলে ব্যারি বলল আর দুদিনের মধ্যে ও জলার কাজে হাত দেবে। আজ আমার কেন যেন মনে হল ওকে বলি জলার রহস্যকে তার মতই থাকতে দিতে। সেই রাতে আমি আবার সেই স্বপ্নের শহরকে দেখতে পেলাম। কিন্তু এবার সেই শহরের উপর ভাসছে কালো অশুভ এক মেঘ। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মৃত্যুর হাহাকার। শুধু আর্তেমিস এর বিশাল মন্দির সেই মেঘের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের সামনে চন্দ্র পূজারী ক্লেইস এর মূর্তি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে নিরবে অপেক্ষা করছে কোন ভীষণ এক দুর্যোগের জন্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমি উঠে বসলাম আমার বিছানায়। তীব্র সুরের শব্দে কিছুক্ষণের জন্যে বুঝতে পারছিলাম না আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি না জেগে উঠেছি। সামনে জানলা দিয়ে আসা পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় পুরনো দৃশ্যের প্রাচীন ঘরটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি চাইছিলাম ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু সেই তীব্র অপার্থিব শব্দটা আমায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল উত্তরের জানলার দিকে। আমি প্রাণপণে চাইছিলাম এদিকে না তাকাতে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় ক্রমাগত সতর্ক করছিল যে, ওখানে এমন কিছু ভয়াবহ দৃশ্য অপেক্ষা করছে আমার জন্যে যার সাক্ষী না হওয়াই মঙ্গল।

বিস্তীর্ন প্রান্তর ভেসে যাচ্ছিল চাঁদের আলোয়, আর সেই প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এমন এক রঙ্গমঞ্চ যা কোনো জীবিত মানুষ কোনোদিন ভুলতে পারে না। অসংখ্য ছায়ামূর্তি চাঁদের রুপালী আলোয় এক অদ্ভুত নাচে মেতেছিল সেই তীব্র জান্তব সুরের তালে তালে। মনে হচ্ছিল আকাশের চাঁদকে উদ্দেশ্য করে আদিম উপজাতি মেতেছে ফসল কাটার উৎসবে। প্রচণ্ড চমকে উঠে দেখলাম সেই অশরীরী ছায়ামূর্তিদের মাঝে কিছু মানবশরীর তাল মিলিয়ে নাচছে, তারা সেই শ্রমিকরা। সূর্যের আলোয় জ্ঞান ফেরার পর মনে করতে পারলাম না কখন জানলার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি। তার পরেই আমার মনে হল ব্যারিকে জানানো উচিত এই অদ্ভুত ঘটনার কথা। কিন্তু রোদ্রজ্জ্বল শরতের সকাল যেন রাতের স্বপ্নকে ব্যঙ্গ করছিল। অনেক ভেবে আমি কথাটা ব্যারিকে না বলে গ্রামের শ্রমিকদের সাথে কথা বলাই ঠিক করলাম। কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের কেউই গত রাতের কথা কিছু মনে করতে পারল না। ব্যারি সারাদিন লাইব্রেরিতে ওর বই নিয়ে বসে থাকল। সন্ধেবেলা অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমার মনে একটা অশুভ ভয় বাসা বাধল। প্রথমবারের জন্যে মনে হল ওই বিশাল জলাভূমির নীল জল আর তার নীচের অজ্ঞাত রহস্যকে দিনের আলোয় নশ্বর মানুষের চোখের সামনে আনার চেষ্টা না করাই ভালো। কে জানে কেন আমার এই দুর্গ আর গ্রাম থেকে অনেক দুরে পালাতে ইচ্ছে করছিল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে শেষে ব্যারিকে বলেই ফেললাম আমার দুশ্চিন্তার কথা। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই ও আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। আমাদের দুই বন্ধুর সামনে কিল্ডারির রক্তিম সূর্য অস্ত গেল।

সেই রাতের ঘটনা সত্যি ছিল না পুরোটাই স্বপ্ন, তা আজও আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটা পুরো উপত্যকার সমস্ত মানুষের অদৃশ্য হওয়াকে কি করে স্বপ্ন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তাও আমি জানি না। একটা চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি ঘুমোতে গেলাম রাতে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় ভাবতে লাগলাম ব্যারির কথা। জলাভূমি শুকিয়ে গেলে এই উপত্যকার উপর নেমে আসা অভিশাপের কথা। এমনকি ভীষণ ইচ্ছে করছিল ব্যারিকে নিয়ে ওর গাড়ি করে এখুনি এই নিস্তব্ধ দূর্গ ছেড়ে পালানোর। কিন্তু কিছু করার আগেই আমি ডুবে গেলাম সেই প্রাচীন শহরের স্বপ্নে। মনে হয় তীব্র সুরের জন্যেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চোখ খুলেই ঘরে যে দৃশ্য দেখলাম তার জন্যে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। জানলা দিয়ে এক লাল অপার্থিব আলো পুরো ঘরটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। প্রথম কথা আমার মনে এল, আমায় পালাতে হবে এই উন্মত্ততা থেকে। তীক্ষ্ণ সুরের শব্দ আমাকে ঠিক করে কিছু ভাবতে দিচ্ছিল না। আমি বিছানা থেকে নেমে প্রথমেই ড্রয়ার থেকে আমার রিভলবারটা বার করে হাতে নিলাম। তারপর দরজার দিকে এগোতে গিয়ে চোখ পড়ে গেল জানলার বাইরে।

অপার্থিব আলোর উৎস ছিল জলার মাঝের সেই ধ্বংসস্তুপ। জানি না আমি সাময়িক ভাবে পাগল হয়ে গেছিলাম কিনা, কিন্তু তীব্র লাল আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছিল অপূর্ব গ্রীক স্থাপত্য, মার্বেলের রাস্তা, উঁচু বাড়ি আর আকাশের দিকে উঠে যাওয়া মন্দিরের চূড়া, সবই আমার স্বপ্নের মত প্রাচীন সময়ের পূর্ণ গরিমার। অবিরামভাবে আমি বাঁশি আর ড্রামের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আর তার সাথে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য ছায়া নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে সেই শহরের মাঝে। সমস্ত দৃশ্যটাই এতই অবিশ্বাস্য অথচ জীবন্ত ছিল যে আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম। আমি এবার চোখ ফেরালাম গ্রামের দিকে। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম তা আগের আতঙ্ককে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

গ্রাম থেকে জলার দিকে এক অদ্ভুত মিছিল যাচ্ছিল। অসংখ্য অন্ধকারে গড়া ছায়ামূর্তি তাদের অদ্ভুত নাচের ভঙ্গি

মায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল মিছিলের। আর তাদের পিছনে বুদ্ধিহীন মৃত মানুষের মত নিজেদের অবশ শরীর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল গ্রামের শ্রমিকরা। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দুর্গের দরজা থেকে আরেকটা মিছিলও এগিয়ে চলেছে জলার দিকে। একদল পরিচালক যেন তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো অশুভ শক্তির টানে এগিয়ে চলেছে আগের মিছিলে যোগ দিতে। এই দলের মাঝে দুর্গের বিশালবপু রাঁধুনির চেহারাটা স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সুর আর ড্রামের শব্দ এতই তীব্র হয়ে উঠল আমায় দুহাতে কান চাপা দিতে হল। আর তখনই প্রচণ্ড আতঙ্কে লক্ষ্য করলাম, ছায়ামূর্তিরা একে একে জলার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে একে একে সমস্ত শ্রমিক আর পরিচালকরা নির্বিকারে জলায় নেমে পড়ল। আর তারপর নিস্তরঙ্গ সবুজ জলে কোন চিহ্ন না রেখে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। সাথে সাথে সমস্ত শব্দ থেমে গেল, জলার আগুনও যেন কোন অদৃশ্য হাত এক ঝটকায় নিবিয়ে দিল। আমার সামনে পড়ে রইল চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া জনহীন এক উপত্যকা। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব তখন, জানি না আমি সুস্থ না পাগল হয়ে গেছি, নাকি পুরোটাই স্বপ্ন। আমি প্রাণপণে ছোটবেলায় পড়া গ্রীক দেবদেবীদের নাম মনে করে তাদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আজ রাতে একটি পুরো গ্রামের সমস্ত মানুষের মৃত্যুর সাথী হলাম আমি আর তার জন্যে দায়ী আমার বন্ধু ডেনিস ব্যারি। তখনই দুর্গের নিচের ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শব্দের তীব্রতা আর অমানুষিকতা আমার সমস্ত সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সেই অপার্থিব চীৎকারকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না শুধু বলতে পারি যে ওটা যার গলা দিয়ে বেরোচ্ছিল একদিন তাকে আমি বন্ধু বলে জানতাম। খোলা জানলা দিয়ে আসা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বাইরের দিকে দৌড়লাম। বাকি রাত কী হয়েছিল জানি না কিন্তু পরের সকালে কিছু লোক আমায় ব্যলিলগ স্টেশনের কাছে নিজের কথা বলতে দেখে। পরে শুনেছি আমি নাকি প্রায় এক সপ্তাহ হাসপাতালে অসংলগ্ন ভাবে জলায় দেখা কোন ঘটনার কথা বলতাম। আজ কয়েক বছর পরেও যখন দুটো অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ে আজও আমি নির্জন রাস্তায় নিস্তব্ধ চাঁদের আলোয় চমকে উঠি।

কিল্ডারির দুর্গ থেকে বেরিয়ে যখন আমি পালাচ্ছিলাম জলার ধার দিয়ে। একটা নতুন শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু উপত্যকার জলায় আগে কখনও শুনিনি। জলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম থকথকে সবুজ জলের ভিতর বিরাট ব্যাঙেরা অনবরত ডেকে যাচ্ছে। সবুজ জলের মধ্যে জ্যোৎস্নায় একটি বিশালবপু কুৎসিত ব্যাঙ কেন যেন আমায় দুর্গের রাধুনির কথা মনে করিয়ে দিল। এই অদ্ভুত সাদৃশ্য আমায় যতটা ভয় পাওয়ালো তার থেকেও আতঙ্কিত পেলাম জলার গভীরে তাকিয়ে। ব্যাঙগুলো যেদিকে ফিরে ডাকছিল সেদিকে তাকিয়ে জলার উপর একটা আবছা অপার্থিব আলো দেখতে পেলাম। আমার কল্পনায় যেন সেই আলোয় কোনো আবছা ছায়া ভেসে যাচ্ছিল ধ্বংসস্তূপের দিকে। আমি হয়ত তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলাম, কিন্তু তবু সেই ছায়ার মধ্যে আমি দেখেছিলাম এক বিকৃত নারকীয় মুখ, আমার বন্ধু ডেনিস ব্যারির মুখ।

একটি পৃথিবী চাই মায়ের আঁচলের মতোন

সহজীবী

দুঃস্থ শিশুদের সাহায্যার্থে
একটি অরাজনৈতিক এবং
বেসরকারী উদ্যোগ

খোপ www.sohojibi.blogspot.com
ই-যোগাযোগ sohojibi@gmail.com
চলভাষ ৯২৩১০-৭১৩৩৪

কিছুটা ইতস্তত পাগলামি

কিছুটা ঝিমধরা নদীর আনমনা স্রোত

স্মৃতির পলেস্তরা খসে পড়ে মগ্ন বিকেলে

তবুও অংকের খাতা জানে—
প্রেম এলে আজো মেঘ করে আসে

বৃষ্টির জলে থাকে কবিতার পূর্বাভাস...

মেঘজন্ম

তরুণ কবিদের মুখপত্র

পরবর্তী সংখ্যা ২৫ বৈশাখ
সম্পাদনায় বিশ্বদীপ দে, দেবব্রত কর বিশ্বাস।

মুদ্রণ মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯৮৩০২-৩৩৯৫৫
অক্ষর বিন্যাস ইমেজ, ৯৮৩০৮-২৪৮৭২
প্রকাশক বিশ্বব্রত আচার্য্য
সম্পাদকীয় যোগাযোগ প্রযত্নে রতন বিশ্বাস, বেনেপুকুর, গোবিন্দপুর (এম), মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১
কথা ৯৮৩০২-২৫৬৮৭ (বিশ্বদীপ দে)
ই-যোগাযোগ debabrata20in@gmail.com / biswadipdey3@gmail.com

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বিশ্বদীপ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com